গাউছে পাকের জীবনী গ্রন্থ

গাউছুল আযম

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী

মুহাম্মদী কুতুবখানা

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

গাউছে পাকের জীবনী গ্রন্থ

গাউছুল আযম

মূল ঃ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী
(রহমতুল্লাহে আলাইহে)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

প্রকাশনায় ঃ
নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশ কাল ঃ
১লা এপ্রিল, ২০০৩ ইং
পুনঃমুদ্রণ ঃ ১ মে ২০০৫
ঃ ১লা এপ্রিল - ২০০৮ইং

৬০ টাকা

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ
এনাম প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অনুবাদকের কথা

সৈয়্যদেনা গাউছুল আযম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর অগনিত জীবনী গ্রন্থের মধ্যে আরবী ভাষায় রচিত 'বাহজাতুল আসরার' কিতাবটি খুবই প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'যুবদাতুল আছার' নাম দিয়ে ফাসী ভাষায় 'বাহজাতুল আসরার' এর সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেন, যা ভারতবর্ষে খুবই সমাদৃত হয়। কালের বিবর্তনে ফার্সী ভাষার চর্চা কমে যাওয়ায় জনাব পীরজাদা আল্লামা ইকবাল আহমদ ফারুকী 'গাউছুল অরা' নাম দিয়ে এর উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং উর্দু ভাষা ভাষীদের কাছে এটা খুবই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কয়েকযুগ আগে বাংলা ভাষায়ও এর একটি অনুবাদ বের হয়েছিল। কিন্তু বইটি বর্তমানে খুবই দুস্পাপ্য হওয়ায় এবং সুধি পাঠকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমি 'গাউছুল আযম' নামকরণ করে 'গাউছুল অরা' এর বাংলা অনুবাদে প্রয়াসী হলাম। আশা করি সুধি পাঠক সমাজের কাছে বইটি সমাদৃত হবে।

যতটুকু সম্ভব বইটি হুবহু অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। এরপরও কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে, মূল লেখকের নয়, অনুবাদকের দুর্বলতা হিসেবে ধরে নিতে হবে। বিজ্ঞ পাঠক মহলের নজরে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে এবং তা যথাসময়ে জানালে, ইনশা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করনে সংশোধন করে নেব।

অনুবাদক

বিষয় **সূচী** পৃষ্ঠা

◇ আমার এ পা সমস্ত ওলীগনের কাঁধের উপর ---------- ৮
◇ তিন আউলীয়া কবরে জীবিত ---------- ৯
◇ নবী ও ওলীগনের প্রতি খোদায়ী আদেশের পার্থক্য ---------- ১২
◇ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মাশায়েখে কিরামের দৃষ্টিতে হযরত গাউছুল আযম ------১৪
◇ গাউছে পাকের বংশ পরিচয় ---------- ২১
◇ গাউছে পাকের আওলাদ ---------- ২৪
◇ বিভিন্ন স্থানে গাউছে পাকের বংশধরের বসবাস ---------- ২৭
◇ গাউছে পাকের যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান ---------- ২৮
◇ মুহিউদ্দীন নামকরণ হওয়ার কারণ ---------- ৩০
◇ তরীকায়ে রূহানিয়াত ---------- ৩০
◇ গাউছে পাকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ---------- ৩২
◇ অদৃশ্য ব্যক্তি ও জ্বীনদের আগমন ---------- ৩২
◇ শয়তানের হামলা প্রতিহতকরণ ---------- ৩৪
◇ শয়তানের প্রতারণা ও চালবাজি ---------- ৩৪
◇ শয়তানী আলো আধারে পরিণত ---------- ৩৫
◇ বাগদাদ শহর থেকে শোস্তর শহর গমন ---------- ৩৬
◇ হযরত বড়পীর সাহেবের শরীরে মাছি বসতো না ---------- ৩৬
◇ ওয়াজের মজলিসে সাপ ---------- ৩৮
◇ সরকারে দো'জাহান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র থু থু নিক্ষেপ- ৩৯
◇ গাউছে পাকের মজলিসে নবীগনের আগমন ---------- ৪১
◇ গাউছে পাকের কথার প্রভাব ---------- ৪৪
◇ গাউছে পাকের মজলিসের রূহানী আওয়াজ ---------- ৪৬
◇ বায়তুল মুকাদ্দস থেকে এক কদমে বাগদাদ ---------- ৪৮
◇ গাউছে পাকের নিজের ভাষায় তাঁর মরতবা ---------- ৪৮
◇ গাউছে পাকের মূল্যবান পোষাক ---------- ৫০
◇ গাউছে পাকের কারামাত ---------- ৫০
◇ গাউছে পাকের দরবারে মাসও বছরের উপস্থিতি ---------- ৫২
◇ তের ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা পূরণ ---------- ৫৩
◇ এক ব্যবসায়ীর বর্ণনা ---------- ৫৬
◇ দার্শনিক জ্ঞান বিলুপ্তিকরণ ---------- ৫৭
◇ গাউছে পাকের জালালী হালত ---------- ৫৮
◇ ভুনা মোরগের ঘটনা ---------- ৫৯
◇ জন্মান্ধ ও মাজুর ছেলের আরোগ্য লাভ ---------- ৫৯
◇ রাফেজী তওবা করলো ---------- ৬০
◇ গাউছে পাকের সামনে অদৃশ্য জগতের অধিবাসী ---------- ৬১
◇ বাগদাদ থেকে নাওন্দ গমন ও প্রত্যাবর্তন ---------- ৬১
◇ জ্বীনদের থেকে অপহৃত মেয়ে উদ্ধার ---------- ৬২
◇ বাগদাদে অগ্নিপাত ---------- ৬৪
◇ শায়খ আবু বকরের আধ্যাত্মিক শক্তি রহিতকরন ---------- ৬৪
◇ শায়খ এবাদের দাবী ---------- ৬৬
◇ শায়খ হামাদ দবাসের হাত ও আলমে বরযখ ---------- ৬৭
◇ গাউছে পাকের উন্নত আখলাক ---------- ৭০
◇ গাউছে পাকের মুরিদানের মর্যাদা ---------- ৭৪
◇ এক মুরিদের আশ্চর্যজনক ঘটনা ---------- ৭৫
◇ রাতির আলো ও এর রহস্য ---------- ৭৮
◇ মুশকিল আসান ও হাজতপূরণের জন্য নফল নামায ---------- ৭৯
◇ বেসাল মুবারকের বর্ণনা ---------- ৭৯

সৈয়্যদেনা গাউছে পাকের জীবনী গ্রন্থ

গাউছুল আযম

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى كشف لاوليايه ما لا يحيط بعلم العقل والقياس واوصل محبيهم ومعتقديهم الى مالايمكن الوصول اليه لسائر الناس والصلوة على حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى الذى لايمكن العروج الى مراتب العلى الا بتابعته فيما اتى فمن كان متابعته اكثر ففضله اعظم واوفوان اكرمكم عند الله اتقكم وعلى اله واصحابه النجوم المهدى وعلى جميع متبعيه اهل الكرم والتقى-

এ গ্রন্থখানা জনাব গাউছুস সকলাইন শায়খ মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মহত জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত। এটা প্রখ্যাত 'বাহজাতুল আসরার' কিতাবের সংক্ষিপ্ত সার। উল্লেখ্য যে 'বাহজাতুল আসরার'কে তাসাউফের উচ্চস্তরের কিতাব হিসেবে গন্য করা হয়, যার লিখক মোল্লা নুরুদ্দিন আবুল হাসন আলী ইবনে ইউসুফ শাফেয়ী লাখমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ওলামায়ে কিরামের মধ্যে খুবই সুপরিচিত। বিভিন্ন কিতাবে তাঁর পরিচিতি পাওয়া যায়।

ইমাম জাহবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে), যিনি একজন অতিশয় সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদ ছিলেন এবং যাকে হাদীছ বর্ণনাকারীগণের কষ্টিপাথর বলা হতো (অর্থাৎ তিনি হাদীছ বর্ণনাকারীগণকে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করতে পারতেন), তিনি 'তবকাতুল মুকাররেয়ীন' কিতাবে 'বাহজাতুল আসরার' কিতাবের প্রণেতা সম্পর্কে লিখেছেন- 'তাঁর পূর্ব পুরুষগণ সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৬৪০ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরাত শাস্ত্রে খুবই সুনাম অর্জন করেন'।

ইমাম জাহবী 'তবকাতুল মুকাররেয়ীন' কিতাবে আরও লিখেন– 'আমি স্বয়ং তাঁর কিরাতের ক্লাসে গিয়েছি এবং তাঁর পাঠদানের ধরন আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি জনাব শায়খ সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সত্যিকার আশেকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত শায়খের কামালিয়াত ও মহত জীবন বৃত্তান্তের উপর একটি বড় আকারের কিতাব রচনা করেন'। কিরাত ও হাদীছ শাস্ত্র

বিশারদ ও প্রসিদ্ধ 'হিসনে হাসিন' কিতাবের রচয়িতা জনাব শায়খ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ জযরী 'আহওয়ালে কেরা' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আমি বাহজাতুল আসরার' কিতাবটি মিসরে পড়ে ছিলাম এবং আমাকে যথারীতি এর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এ কিতাবের লিখক ও শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর মাঝখানে মাত্র দু'পুরুষের ব্যবধান ছিল। ওনার সম্পর্কে হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী এ ভাবে সুসংবাদ দিয়েছিলেন– طـوبى لـمن رَانـى ولـمن رانـى مـن رانـى ولـمن رانـى مـن رانـى مـن رانـى (যে আমাকে, আমার দর্শককে বা আমার দর্শকের দর্শককে দেখেছে, সে সৌভাগ্যবান)। শায়খুল হেরেমাইন আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর রচিত 'রওজাতুর রিয়াহীন' গ্রন্থে এ সুসংবাদটির কথা উল্লেখ করেছেন। অনেক লোক মনে করে যে এ কিতাবটি মখদুম জাঁহানিয়ার কোন মুরিদ লিখেছিলেন কিন্তু এটা ভুল ধারনা। অবশ্য ওনার কোন এক মুরিদ এর ফার্সী অনুবাদ করেছিলেন। আরও অনেকে গাউছে পাকের প্রশংসা সম্বলিত কিতাব রচনা করেন। যেমন 'কামুস' এর রচয়িতা বিশিষ্ট আলেমেদীন শায়খ মজদুদ্দীন সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'রাউজুল মুনাজের ফী মুনাকেবে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের' নামে একটি কিতাব রচনা করেন। সহীহ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ও প্রসিদ্ধ 'মওয়াহেবুল্লাদুনিয়া' কিতাবের প্রণেতা আল্লামা কুসতলানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে)ও 'রাউজাতুয যাহেব ফী মুনাকেবে শায়খ আবদুল কাদের' নামে আর একটি কিতাব প্রণয়ণ করেন। আমি অনেক ওলামায়ে কিরামের মুখে শুনেছি যে তাঁরা গাউছে পাকের প্রশংসা সম্বলিত উল্লেখযোগ্য বারটি কিতাব দেখেছেন, তন্মধ্যে 'বাহজাতুল আসরার' অন্যতম।

'বাহজাতুল আসরার' কিতাবটি গাউছে পাক ও অন্যান্য মশায়েখের মহত জীবন বৃত্তান্তে ভরপুর। এতে বুজুর্গানে কিরামের সে সব বাণীও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যে গুলো গাউছে পাকের শানে পেশ করা হয়েছে। গাউছে পাকের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে কিরাম তাঁর কামালিয়াত ও আগমনের যে সব পূর্বাবাস দিয়ে গেছেন, সে গুলোও কিতাবটিতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। আমি ওসব বাণীগুলোকে সংক্ষেপ করে 'বাহজাতুল আসরারের সংক্ষিপ্ত সার 'জুবদাতুল আছার' নাম দিয়ে প্রকাশ করলাম। আমার আন্তরিক বাসনা যে আমার নামটিও যেন গাউছে পাকের প্রসংশাকারী, মুরিদ ও ভক্তগণের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়। যদিওবা আমরা জনাব গাউছে পাকের বাহ্যিক নূরানী চেহারা দর্শন ও তাঁর পবিত্র মজলিসে অংশ গ্রহন থেকে বঞ্চিত বা অক্ষম, কিন্তু বিভিন্ন কিতাবের বদৌলতে তাঁর গুনাবলী ও কামালিয়াত সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভে সক্ষম।

এটা বাস্তব সত্য যে গাউছে পাকের ফযায়েল ও তাঁর মহৎ জীবনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কিতাব রচনা করা বড় কঠিন কাজ। আজ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু লিখা হয়েছে, তা হচ্ছে অকুল সমুদ্রের এক ফোঁটা পানি সমতুল্য।

শায়খুল হেরেমাইন হযরত আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, 'তাঁর গুণাবলী এত উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান যে, যদি সমস্ত ফুলের পাপড়ি গুলোকে কাগজে পরিণত করা হয় এবং বাগানের সমস্ত ডালিকে কলম বানানো হয়, তার পরও তাঁর গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। তাঁর কামালিয়াত সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে বড় বড় আরিফগণও বিফল হয়েছেন। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ ভাবে লিপিবদ্ধ করা কোন লিখন পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। সারা জীবন লিখেও তা শেষ করা যাবে না।'

ইমাম ইয়াফেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উপরোক্ত বক্তব্যটি কুরআন শরীফের এ আয়াতেরই প্রতিধ্বনি– لو كان البحر مداد لكلمات ربى – ولو ان مافى الارض من شجرة اقلام – অর্থাৎ যদি সমুদ্রের সমস্ত পানি কালি হয় এবং জগতের সমস্ত বৃক্ষরাজি কলম হয়, তবুও আল্লাহর প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবে না।

ধর্মীয় বিশ্লেষকগনের মতে ওলীউল্লাহ ও আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণের প্রশংসা ও কামালিয়াত বর্ণনা করার জন্য এ ধরনের উদাহরণে কোন ক্ষতি নেই। নতুবা আল্লাহর অগণিত গুণাবলী ও তাঁর অপরিসীম মর্যাদা যে কোন উদাহরণের উর্ধে, তাঁর গুণাবলীর সাথে কোন কিছুর উদাহরণ বা তুলনা হতে পারে না।

ইমাম ইয়াফেয়ীর বক্তব্যটি যথাযথ ও সঠিক। এতে কোন প্রকারের সন্দেহ বা সংশয় করার কিছু নেই। কারণ গাউছে পাকের মহৎ জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে এর যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়। জনাব গাউসুল আযমের জন্ম, দুধপান ও শৈশব কাল থেকে বেলায়েতের লক্ষণ ও নানা কারামাত পরিলক্ষিত হচ্ছিল। যেমন তিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় মায়ের দুধ পান করতেন না। এ কথাটি সবার কাছে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে সৈয়দ বাড়ীর অমুক ঘরে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় মায়ের দুধ পান করেন না।

একবার লোকেরা গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করেছিল যে তিনি কখন থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি একজন আল্লাহর ওলী। তিনি বলেছেন, 'একদিন আমি মাদ্রাসায় যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম আমাকে পরিবেষ্টন করে অনেক ফিরিশতা আমার সাথে যাচ্ছে। ফেরার পথেও এ ফিরিশতাগণকে দেখতে পেলাম। এরপর থেকে এ ভাবে ওনারা আমার সাথে চলাচল করতেন। এমনকি আমি ওনাদের কথাও শুনতাম। যখন ওনারা বললেন, আল্লাহর ওলীর জন্য জায়গা ছেড়ে দাও,

তিনি তশরীফ রাখবেন, তখন আমার সম্পর্কে আমার মনে এ ধারনাটা সৃষ্টি হতো যে আল্লাহ তাআলার এ করুণা সমূহ আমার জন্যই নাযিল হচ্ছিল। ঐ সময় আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর'।

এরপর থেকে একের পর এক তাঁর কারামাত প্রকাশ পেতে থাকে। শায়খ আলী বিন হায়তী (রহমতুল্লাতে আলাইহে) বলেন- 'আমি আমার যুগে শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর মত এমন কোন ওলীউল্লাহ দেখিনি, যার থেকে এত অগণিত কারামাত প্রকাশ পেয়েছে। যে কেউ যখনই যে ধরনের কারামত দেখার ইচ্ছা পোষণ করতো, সেটা তখন তাঁর থেকে প্রকাশ পেত। এ সব কারামত কোন সময় তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ পেত আবার কোন সময় তাঁর ইচ্ছা ছাড়াও প্রকাশ পেত'।

শায়খ শাহাব উদ্দীন (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন- হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) ছিলেন- سلطان الطريق والتصرف فى الوجود التحقيق। তরীকত ও সৃষ্টিকূলের অস্তিত্বের উপর হস্তক্ষেপকারী সম্রাট। শায়খ আবু সাঈদ আহমদ বিন আবু বকর হরিমী, শায়খ আবু ওমর ও উসমান ফায়মী বলেন- 'সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) ছিলেন উদারহস্ত এবং কারামাত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর উৎস। তাঁর কারামাত সমূহ পবিত্র মুক্তারাজির মত সব সময় গৃহিত ও প্রশংসিত হত এবং অনবরত প্রকাশ পেত। আমরা অনুমান করতে পারি না যে এটার শেষ কোথায়। নব্বই বছর হয়ে গেল কিন্তু ওনার কারামাতের সিলসিলা এখনও জারি আছে'।

তাঁর ইবাদত, রিয়াজত ও মুজাহেদাত ছাড়াও তাঁর জ্ঞান, আমল ও জীবন বৃত্তান্তের বিস্তারিত বর্ণনা সহীহ ও নির্ভরযোগ্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে। তাঁর সমসাময়িক মাশায়েখে কেরাম তাঁর অগণিত কারামাত ও ফজায়েল বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমাম ইয়াফেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলতেন যে, তাঁর (গাউছে পাক) কারামাতরাজি স্বাভাবিক নিয়ম থেকে এত অধিক স্বীকৃত প্রাপ্ত যে, যা পৃথিবীর অন্য কোন ওলীউল্লাহের বেলায় পাওয়া যায় না।

আমার এ পা আল্লাহর সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর

قَدَمِىْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِىِّ اللّٰهِ (আমার এ পা আল্লাহর সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর)- জনাব গাউছে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ ঘোষণাকে এক বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ঘোষনা যখন বিশ্বময় প্রতিধ্বনিত হলো, তখন পূর্ববর্তী শায়খ ও ইমামগণ এ ঘোষণার সম্মানে মাথানত করলেন এবং

সমসাময়িক পীর ওলীগণ কাঁধ ঝুকায়ে দিলেন। উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পূর্ব-পশ্চিম মোট কথা দুনিয়ার সমস্ত মাশায়েখে কিরাম এ ঘোষণা স্বীকার করে নিলেন। আধ্যাত্মিক জগতের তৎকালীন মনীষীগণ এ ঘোষণার উপর খুবই মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'বাহজাতুল আসরার' এর প্রণেতা লিখেছেন- কয়েকজন মাশায়েখ (যার মধ্যে শায়খ আবু মুহাম্মদ শবকী বতায়েহীও ছিলেন) আমাকে বলেন যে, একদিন শায়খ আবু বকরের মজলিসে বুজুর্গানে কিরাম সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলেন, আজমে এমন এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনি বাগদাদে থাকেন। তিনি ঘোষণা করবেন- 'আমার এ কদম সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর'। তাই প্রত্যেক ওলীর জন্য অপরিহার্য যে এ ঘোষনা শুনার পর যেন সেই মহান নির্দেশের সামনে মাথানত করে দেয়, কেননা তিনি তাঁর যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

'বাহজাতুল আসরার' এর প্রণেতা আরও লিখেন যে, বিশিষ্ট বুজুর্গ আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন আয়ুব হামদানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আমাকে বলেছেন যে, শায়খ আবু আহমদ আবদুল্লাহ বিন আলী বিন মূসা নজ্‌ফী বলতেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে অদূর ভবিষ্যতে ইরাকে এমন এক মহান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবেন, যিনি অনেক কারামাত প্রদর্শনকারী হবেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকূলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন। তিনি ঘোষণা করবেন- قَدَمِىْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِىِّ اللّٰهِ (আমার এ পা আল্লাহর সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর) দুনিয়ার সমস্ত ওলী তাঁর সামনে কাঁধ বুঝায়ে দিবেন। সব বুজুর্গ তাঁরই স্বীকৃতি ও সত্যায়ন দ্বারা বেলায়েত লাভ করবেন এবং তিনিই প্রত্যেকের জন্য সুপারিশ করবেন।

তিন আউলীয়া কবরে জীবিত

শায়খ আকীল মনজী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আমি এমন তিন বুজুর্গানে কিরামকে দেখেছি, যাদের হস্তক্ষেপ কবরের মধ্যেও বলবৎ আছে। এ হস্তক্ষেপ জিন্দেগীর সমস্ত ক্ষমতারই অনুরূপ। তাঁরা হলেন- শায়খ আবদুল কাদের জিলানী, শায়খ মারুফ করখী এবং শায়খ হায়াত বিন কাইস হরানী। ইরাকের বিশিষ্ট বুজুর্গ শায়খ আলী করশী, উল্লিখিত তিন বুজুর্গানে কিরামের সাথে শায়খ আকীল মনজী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর নামও যুক্ত করেছেন।

শায়খ ফযিল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো- এ জমানার কুতুব কে? তিনি বললেন- উনি এখন মক্কা শরীফে আছেন। তবে সাধারণ

লোকদের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত। অবশ্য আল্লাহর ওলীগণ তাঁকে চিনেন। তিনিই জমানার কুতুব এবং শীঘ্রই বাগদাদ থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি যখন লোকদের সাথে কথা বলবেন, তখন লোকেরা তাঁর কারামত দ্বারা তাঁকে চিনে ফেলবেন যে তিনিই বর্তমান যুগের কুতুব। তিনি বলবেন- قدمی هذه علی رقبه کل ولی الله। (আমার এ পা আল্লাহর সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর) আল্লাহর ওলীগণ তাঁর পদতলে কাঁধ নুইয়ে দিবেন। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে তাঁর পদতলে থাকবো। তিনি সেই ব্যক্তি, যার কারণে আল্লাহর সৃষ্টিকূলের সীমাহীন উপকার হবে এবং আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তিকে এত অধিক কারামাত দান করেছেন, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি।

শেষ পর্যায়ের মাশায়েখে কিরামের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান তফসুনজী সহ কয়েকজন মাশায়েখ বর্ননা করেছেন যে সৈয়্যদেনা শায়খ আবদুল কাদের যখন যুবক ছিলেন, তখন আমাদের শায়খ তাজুল আরেফীন আবুল ওফা (রাহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। জনাব শায়খ আবদুল কাদের যখনই শায়খ আবুল ওফাকে দেখতেন, সাথে সাথে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর সাথীদেরকে হযরত শায়খের সম্মানার্থে দাঁড়াতে নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন- ইনি এ যুগের বড় ওলী।

একদিন শায়খ আবুল ওফা হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের (রাদি আল্লাহ আনহু) এর সমীপে আরয করেন, যখন আপনি কামালিয়াতের উচ্চস্থরে পৌঁছবেন, তখন নিশ্চয় আমাকে স্মরণ রাখবেন এবং স্বীয় সহানুভূতি বজায় রাখবেন। এরপর বললেন, হে আবদুল কাদের! প্রতিটি পাখী কিছুদিন বিচরণ করে নিরব হয়ে যায় কিন্তু আপনার রূহানী পাখী কিয়ামত পর্যন্ত বিচরন করবে।' শেখ আবুল ওফা যখন বারবার এ কথাটি বলছিলেন, লোকেরা ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি ওনাকে এত ইজ্জত-সম্মান কেন করেন? তিনি বললেন, হে সহচরগণ, এমন এক সময় আসবে যখন এ যুবক আবাল বৃদ্ধ বনিতার জন্য পথ প্রদর্শক হবেন এবং সমস্ত লোক তাঁর মুখাপেক্ষী হবে। আমি আমার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এটা বলতে পারি যে তাঁর সেই দাবী- 'আমার পা সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর' একেবারে সঠিক। সমস্ত ওলীগন তাঁর সামনে কাঁধ নুইয়ে দিবেন। আপনাদের মধ্যে যিনিই সে সময় থাকবেন, ওনার জন্য অপরিহার্য যে এ দাবীর প্রতি যেন দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করে।

শায়খ শাহাব উদ্দীন ওমর সহরওয়ার্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, আমার চাচাজান ও মুর্শিদ শায়খ আবুন নজীব আবদুল কাদের সহরওয়ার্দী (রহমতুল্লাহে

আলাইহে) বলেছেন যে, তিনি একদিন শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে বসেছিলেন। (যিনি সে সময়ের একজন ওলী ছিলেন) হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহ আনহু) প্রথম অবস্থায় তাঁর মজলিসে আসা যাওয়া করতেন, কাজ কর্ম করতেন এবং খুবই আদব সহকারে মজলিসে বসতেন। সে দিন সৈয়্যদেনা শায়খ আবদুল কাদের যখন মজলিস থেকে উঠে চলে গেলেন, তখন শায়খ হাম্মাদ বললেন- এ আজমী যুবকের কদম এত উচুঁ যে এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত ওলীগণের কাঁধ এর নিচে হবে এবং তাঁকে নির্দেশ দেয়া হবে যেন ঘোষণা করে- قدمی هذه علی رقبه کل ولی الله (আমার এ পা আল্লাহর সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর)

এ ধরনের সুসংবাদ অনেক মাশায়েখ আগ থেকে দিয়েছিলেন। একবার শায়খ আবু মদয়ান শোইয়েব স্বীয় কাঁধ নুইয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে, তোমার ফিরিশতাগণকে এবং এ মজলিসে উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি এবং কাঁধ নুইয়ে দিয়েছি। তাঁর সহচরগণ জিজ্ঞেস করলেন- এ কথার রহস্য কি? তিনি বললেন- এ মাত্র শায়খ আবদুল কাদের জিলানী বাগদাদে ঘোষণা করেছেন- قدمی هذه علی رقبه کل ولی الله (আমার এ পা আল্লাহর সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর)

শায়খ আদী বিন মুসাফির (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেছেন- শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহ আনহু) আমার প্রশংসা করে বলতেন যে, যদি নাবুয়াত মেহনত বা প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জন করা যেত, তাহলে সেটা শায়খ আদী বিন মুসাফির পেতেন। শায়খ আদীকে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো- এটা কেমন কথা, আজ পর্যন্ত কোন ওলী সেই দাবী করেননি, যা শায়খ আবদুল কাদের করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ দাবী অন্য কেউ করতে পারে না। তিনিতো (শায়খ আবদুল কাদের জিলানী) একত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। এ রকম একত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে যতক্ষণ কোন কথা বলার নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ তিনি কিছু বলেন না। হযরত শায়খকে যখন নির্দেশ দেয়া হলো, তখনই তিনি এ দাবী করলেন। এ কারনেই সমস্ত ওলীগণ তাঁর দাবীর সামনে মাথানত করলেন। যে ভাবে ফিরিশতাগণ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সিজদা করেছিলেন, সে ভাবে আল্লাহর সমস্ত ওলীগণ নিজেদের মাথা অবনত করলেন।

হযরত শায়খ আবুন নজির সহরওয়ার্দী বলেন আমিও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যে মজলিসে হযরত শায়খ সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী দাবী করলেন-

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আমার পা সমস্ত ওলী গণের কাঁধের উপর। আমিও মাথা নুইয়ে দিয়েছিলাম। এমন কি তা মাটিতে গিয়ে লেগেছিল এবং আমি তিনবার বলে ছিলাম- علی راسی- علی راسی- علی راسی- আমার মাথার উপর, আমার মাথার উপর, আমার মাথার উপর।

শায়খ খলিফা আকবর (যিনি অধিক স্বপ্ন দেখতেন) বর্ণনা করেছেন- আমি একবার সরকারে দু'আলম (সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি আরয করলাম, ইয়া রসুলল্লাহ, শায়খ আবদুল কাদের দাবী করেছেন- 'আমার পা সমস্ত ওলীগনের কাঁধের উপর।' হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, শায়খ আবদুল কাদের সত্য বলেছে। সে এ যুগের কুতুব। ওর প্রতি সবার সমর্থন আমার কাম্য।

কয়েক জন মাশায়েখ হযরত শায়খ আবু সাঈদ কিলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন- শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) যে বলেছেন- 'আমার এ পা সমস্ত ওলীগণের কাঁধের উপর' তা কি নির্দেশ মূলক ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা কুতবিয়তের নিদর্শন। প্রতিটি যুগে দায়িত্ব প্রাপ্ত কুতুব ও সব কাজ নীরবে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। কারণ নীরব থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। কিন্তু কতেক কুতুবকে ঘোষনা করার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তাঁদের এটা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না, যদিওবা এ রকম ঘোষনার দ্বারা ওনাদেরকে নানা সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়। এ ধরনের ঘোষনা সর্বোচ্চ কুতবিয়াতের পরিচায়ক। মোট কথা এ বিষয়ে আমার কাছে অগণিত সংবাদ ও সাক্ষ্য মওজুদ আছে, যদ্দারা এ দাবীর প্রতি জোড়ালো সমর্থন পাওয়া যায়। এ ধরনের সমস্ত দাবী আল্লাহ তাআলার আদেশেই করা হয়ে থাকে।

নবী ও ওলীগনের প্রতি খোদায়ী আদেশের পার্থক্য

নবী ও ওলীগনের প্রতি খোদায়ী আদর্শের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, যা আমি বুজুর্গানে দ্বীনের উক্তি সমূহ ও জনাব গাউছুল আযমের বাণী সমূহের আলোকে প্রকাশ করছি। ওলীগনের প্রতি খোদায়ী আদেশ বলতে সেই সুস্পষ্ট জ্ঞানকে বুঝায়, যা ওনাদের সুস্থ কলব বিনা প্রচেষ্টা ও ধারনায় অর্জন করে এবং যা মানবীয় কলুসতা থেকে মুক্ত, নফসানী কামনা থেকে পবিত্র এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সুস্পষ্ট জ্ঞান ওহী ছাড়া অর্জিত হয়। নাবুয়্যাত ও বেলায়েতের মধ্যে পার্থক্য বুঝার জন্য এ বিষয়টিও বিবেচ্য যে, নাবুয়্যাত হচ্ছে সেই কালাম বা ঘোষনা, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে

জিব্রাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ওহী দ্বারা প্রকাশ পায়। এটা বিশ্বাস করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব এবং অবিশ্বাস করাটা কুফরী। অবিশ্বাস করলে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন বালা মসীবত প্রকাশ পায় এবং জান মালের ক্ষতি হয়। কিন্তু বেলায়েত হচ্ছে সেই বাণী যা ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, যার ফলে ওলীর কলব ও যবান পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। এ বাণী গ্রহণ করার জন্য মজজুবের আত্মা নীরব হয়ে যায়। অতএব নবীগনের জন্য ওহী ও কালাম এবং ওলীগনের জন্য সম্বোধন ও ইলহাম প্রয়োজন। নবীগনকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায় এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর ওলীগনকে অস্বীকার করলে পাপাসক্ত ও বিপথগামী হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে এর থেকে ফানা চাই।

প্রকৃত পক্ষে কাশফের নিয়মনীতি বিদ্যা বুদ্ধির ধ্যান ধারনা থেকে অনেক উর্ধে। বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা কাশফের অনুধাবন অসম্ভব। যেরূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, সেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা কাশফ-শক্তি অনুধাবন করা যায় না। কতেক দার্শনিক বলেছেন- যেটা ঈমানের দ্বারা জানা যায়, সেটা কাশফ থেকে অনেক উর্ধে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন- 'এ তরীকার উপর ঈমান আনাটাও এক প্রকারের বেলায়েত'। যারা মাশায়েখে কিরামের বিভিন্ন উক্তির সাথে ভিন্নমত পোষন করেছেন বা নিজেদের অভিমত প্রকাশের জন্য এমন কথা বলেছেন, যা বিদ্যা বুদ্ধির মাপ কাটিতে পড়ে না, সেটা ওনাদের বিভোর অবস্থার মানসিক অস্থিরতার প্রতিফলন। এ সব ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা না করে মেনে নেয়াটাই উত্তম। এ জন্যই বলা হয়- 'নত শিরে মেনে নাও, বিভিন্ন বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে-

بَل كَذبوا بما لم يَحِيطوا به ويَملانِهم تاويله

(বরং তারা অস্বীকার করেছে, যা তারা বুঝতে পারেনি এবং তারা এর পরিনতি দেখেনি।)

আল্লাহর কাছে এর থেকে ফানা চাই।

উপরোক্ত বক্তব্যটুকু নিম্নের ফার্সী পংক্তি গুলোতে খুবই সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে-

اے که از کشمکش قال ومقال- نیست قوت ادراك کمال

بیج نا یافته درخود اثرے - نه شنیده زکساں جز خبرے

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

قابل کار نه معذوری - یا خود ازکوشش آں بس دوری

باش کیس راه گزار دگراست - ہرکے قابل کار دکراست

ببگر حالت درویشاں را- سوزش وشورش عشق ایشاں را

که دریں راه چه طلبها دارند - زین طلبها چه لعتبها دارند

زیں طلب گرنه خدا یافته اند - این ہمه بہر چه بشتافته اند

درطلب ایں ہمه جانباری چیست - مال واسباب خدا سازی چیست

باری ارنیست ترا وجدا نے - معتقد باش وبیار ایمانے

অর্থাৎ : হে বুদ্ধিজীবী, তুমি জাহেরী বিদ্যা বুদ্ধির চক্রবালে পড়ে আওলীয়ায়ে কিরামের কামালিয়াত বুঝতে অক্ষম। নিজের মধ্যেতো এর কোন প্রভাব নেই। লোক মুখে আংশিক খবর শুনেছ মাত্র। এ কাজের উপযুক্ত তুমি নও বা এ বিষয়ে বুঝতে তুমি চেষ্টাও করনি। তাই এ বিষয়ে যা তা বলিও না, এটা তোমার কাজ নয়। দরবেশগণের প্রেমের জ্বালা ও অনুরক্তি নিরীক্ষন কর। এ পথে তাঁরা কতইনা সাধনা করেন এবং কতইনা মরতবা অর্জন করেন। এ সাধনায় তাঁরা আল্লাহকে না পেয়ে থাকলে কখনো এত কষ্ট স্বীকার করতেন না এবং আল্লাহর পথে এত ধন সম্পদ বিলায়ে দিতেন না। তোমার মধ্যে এ সাধনা না থাকলেও ওনাদের প্রতি আস্থা রেখো এবং ওনাদের বিশ্বাসী হও।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মাশায়েখে কিরামের দৃষ্টিতে হযরত গাউছুল আযম

হুযূর গাউছে পাকের ফযীলত ও কামালাত সম্পর্কে বিশেষ করে তাঁর ঘোষনা- "আমার এ পা সমস্ত ওলীগনের কাঁধের উপর" এর সমর্থনে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক মাশায়েখে কিরাম যে অগনিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেটা তাঁর কামালিয়াতের বড় দলীল।

শায়খ আবু মুহাম্মদ শিবলী বর্ণনা করেন যে, এক দিন শেখ আবু বকর বযায হযরত গাউছে পাকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন- ইরাকে এমন এক বুজুর্গ আত্মপ্রকাশ করবেন, যিনি ফযীলত ও কারামাতের দিক দিয়ে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাঁর কাছে সমস্ত কুতুবগনের অবস্থাদি বিকশিত করা হবে এবং ওনাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমূহ তাঁর কাছে প্রকাশ পাবে।'

'আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সমস্ত অবস্থাদি ও মরতবা সমূহের ব্যাপারে জনাব শায়খ আবদুল কাদেরকে জ্ঞাত করা হবে। কাশফের অধিকারী বুজুর্গানে কিরামের সমস্ত পদ্ধতিও তাঁর সামনে উদ্ভাসিত করা হবে।' তিনি আরও বলেন- আল্লাহ তাআলা শায়খ সৈয়্যদেনা আবদুল কাদেরের বদৌলতে ওলীগনের স্তর বৃদ্ধি করবেন। তাঁর দ্বারা সৃষ্টিকূলের অনেক উপকার হবে।' তিনি পুনরায় বলেন, 'গাউছে পাক ওসব মহান ব্যক্তিগণের অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ফখর ও গর্ববোধ করবেন।'

শায়খ এযায বতায়েহী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিরেন যে ৪৭৮ হিজরীতে শায়খ আবদুল কাদের নামে এক যুবক আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর ভীতিকর আচরনের মাধ্যমে বেলায়তের স্তরসমূহ বিকশিত হবে এবং তাঁর জালালিয়াতের মাধ্যমে অনেক কারামাত প্রকাশ পাবে। তিনি যুগের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রেমের উচ্চস্তরে পৌছে যাবেন। বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে, তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হবে। তিনি তাঁর মহিমান্বিত পদে অটল থাকবেন এবং আগের যুগের সমস্ত ঘটনাবলী তাঁর সামনে মূসা আলাইহিস সালামের উজ্জ্বল হাতের মত উদ্ভাসিত হবে এবং আদিকালের সমস্ত ভেদসমূহ তাঁর কাছে প্রকাশ পাবে। আল্লাহর দরবারে তাঁর শান এত উচু হবে, যা অন্য কোন ওলীর নসীব হবে না।

শায়খ মনছুর বতায়েহী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মজলিসে জনাব গাউছুল আযমের কথা উঠলে তিনি বলেন, অদূর ভবিষ্যতে সেই সময় আসতেছে, যখন সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহ আনহু) অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। দুনিয়ার সমস্ত আরেফীন ওনার অধীনে হবে এবং তিনি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করবেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে ওনার থেকে প্রিয় ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে আর কেউ হবে না। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকবে, ওর উচিত যেন ওনার মর্যাদা বুঝতে চেষ্টা করে এবং ওনাকে ইজ্জত-সম্মান করে।

হযরত শায়খ হামাদ দব্বাস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সামনে হযরত গাউছে পাক (রাদি আল্লাহ আনহু) এর কথা উঠলে, তিনি বলেন- 'যদিওবা আবদুল কাদের এখনও নওজোয়ান, আমি ওনার মস্তকের উপর দুটি ঝান্ডা শোভা পেতে দেখতেছি। এ ঝান্ডাদ্বয় হচ্ছে বেলায়েতের। এ দু'টি পাতালপুরী থেকে ফিরিশতা জগতের সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি নিজের কানে ফিরিশতা জগতে শুনেছি যে ওনাকে ওসব উপাধি দ্বারা সম্বোধন করা হয়, যে গুলো দ্বারা ছিদ্দিকীনে এজামকে সম্বোধন করা হয়।" যখন

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

শায়খ সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) ওনার কাছে তাশরীফ আনতেন, তখন তিনি ওনাকে 'মারহাবা, মারহাবা, হে দৃঢ় পাহাড়, সুউচ্চ পর্বত ও সৈয়্যেদুল আরেফীন' বলে সম্বোধন করে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন।

শায়খ আকিল মনজী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর দরবারে যখন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কথা উঠে এবং বলা হয় যে বাগদাদে এক নওজোয়ান ওলী আত্মপ্রকাশ করেছেন, তখন তিনি বলেন, ওনার হুকুমতো আসমান সমূহের উপরও চলে, উনি বড় মর্যাদাশালী নওজোয়ান। ফিরিশতা জগতে তিনি সাদা বাজপাখী নামে খ্যাত। অদূর ভবিষ্যতে তিনি অদ্বিতীয় বিশিষ্ট মর্যাদা (কুতবিয়াত) লাভ করবেন এবং তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হবে এবং তাঁর থেকেই রূহানী নির্দেশাবলী প্রকাশ পাবে।

শায়খ আবু বফরায়ী মগরেবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সামনে তাঁর কয়েক জন সহচর বাগদাদ যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে, তিনি বলেন, 'যখন তোমরা বাগদাদে যাবে, তখন শায়খ আবদুল কাদের নামে এক নওজোয়ান ওলীর সাথে দেখা করতে যেন ভুল না কর। যখন তোমরা সেই আযমী যুবকের সাথে দেখা করবে, তখন আমার সালাম পেশ করিও এবং আমার জন্য দুআ করতে বলিও। খোদার কসম করে বলছি, আজ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা অনারবে এমন পুরুষ সৃষ্টি করেনি, ইরাকে তাঁর সমকক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ যুবকের কারনে পূর্বাঞ্চল পশ্চিমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। তাঁর জ্ঞান ও বংশ মর্যাদা সৃষ্টি কূলের মধ্যে অদ্বিতীয় করে দেয়া হবে এবং দুনিয়ায় সমস্ত ওলীগণের মধ্যে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হবে।'

শায়খ আদী বিন মুসাফির (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর নিকট শায়খ আবুল কাসেম ওমর বযায় (রহমতুল্লাহে আলাইহে) রূহানী ফয়েজ লাভের জন্য গেলে, তিনি বলেন, "ওমর, তুমি মহাসমুদ্র ছেড়ে একটি নদীর কিনারায় এসেছ। হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) যুগের ওলীগণের সরদার এবং খোদা প্রেমিকগণের সরতাজ।" শেখ আবদুল্লাহ করশী বলতেন যে সৈয়্যেদেনা আবদুল কাদের স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠতম ওলী এবং তিনি পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ ওলী। ওলামায়ে কিরাম তাঁর পিছে পিছে থাকেন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও তাঁকে তাঁদের থেকে উত্তম মনে করেন। তাঁর যুগের মশায়েখে কিরাম সবাই নিজেদেরকে ওনার থেকে অনেক দুর্বল মনে করেন।

শায়খ আবু সাঈদ কায়লবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে কুতুবের গুনাবলী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'একজন কুতুব তাঁর যুগের সমস্ত কার্যাবলী স্বীয়

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কবজায় রাখেন এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত কাজের অধিকার তাঁর হস্তে অর্পন করা হয়।' লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দৃষ্টিতে বর্তমান যুগে এ রকম কুতুব কে? তিনি বললেন, শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীই হচ্ছেন এ রকম ব্যক্তি।'

শায়খ খলীফা শহর মুলকী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনাব গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কে দুনিয়ার সমস্ত ওলী, আবদাল ও কুতুবের আধ্যাত্মিক অবস্থাদি ও ভেদসমূহ সোপর্দ করা হয়েছে। তাঁর জালালী দৃষ্টি যখন পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে পতিত হয়, তখন সেই প্রান্তের উপরিভাগ থেকে শুরু করে পাতালপুরী পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়ে উঠে। ওনাদের এ প্রত্যাশা হয় যে ওনার সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে খায়ের বরকত বৃদ্ধি পাবে কিন্তু এ ভয়ও থাকে যে ওনার জালালী দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক অবস্থাদি বিলোপ হয়ে যেতে পারে। শায়খ আবুল বরকাত বিন ছখরামবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন, 'হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রত্যেক ওলীর জাহেরী ও বাতেনী অবস্থাদির উপর দৃষ্টি রাখেন। কোন ওলী তাঁর অনুমতি ছাড়া স্বীয় জাহেরী ও বাতেনী অবস্থাদির উপর হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এমন ওলীউল্লাহ যারা আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরাও গাউছে পাকের অনুমতি ছাড়া এক কদম এগিয়ে যেতে পারেন না। এ সব ওলীগণের উপর মৃত্যুর আগে এবং মৃত্যুর পরও তাঁর হস্তক্ষেপ বজায় থাকে।

শায়খ আবি মুহাম্মদ কাসিম বিন ওবাইদ বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন– আমি হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম) এর কাছে হযরত সৈয়্যেদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন যে উনি এ সময়কার একক প্রিয় পাত্র। আল্লাহ তাআলা কোন ওলীকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন না, যতক্ষন পর্যন্ত গাউছে পাক মনজুর না করেন। নৈকট্য প্রাপ্ত কোন আল্লাহর ওলীকে বুজুর্গী প্রদান করা হয় না, যতক্ষন পর্যন্ত হযরত গাউছুল আযমের বুজুর্গী মেনে নেয়া না হয়। আল্লাহ তাআলা কাউকে ঐ সময় পর্যন্ত স্বীয় ওলী মনোনিত করেন না, যতক্ষন পর্যন্ত ওনার অন্তরে হযরত গাউছে পাকের প্রতি সম্মানবোধ পরিপূর্ণভাবে মওজুদ না থাকে।

শায়খ মদয়ন (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেছেন– আমি হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম) এর সাথে তিন বছর যাবত দেখা-সাক্ষাত করতেছি। একদিন আমি ওনার সাথে পূর্ব-পশ্চিমের মাশায়েখ সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবং আলোচনা প্রসঙ্গে সৈয়্যেদেনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর কথা উঠলে, তিনি বলেন, উনি ছিদ্দিকীনের

ইমাম, আরেফীনের প্রিয় পাত্র এবং মারেফাতের আত্মা হিসেবে বিবেচ্য। আওলীয়ায়ে কিরামের মধ্যে ওনার শান অত্যন্ত দুর্লভ এবং উনি সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ। আওলীয়ায়ে কিরামের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার শান গাউছে পাকের উর্ধে। আমিও গাউছে পাকের উচ্চ মর্যাদাকে স্বীকার করি। শেখ মদয়ন বলেন, আমি হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম) এর মুখে অন্য কোন ওলীর শানে এর থেকে অধিক প্রশংসা শুনিনি।

শায়খ আবু মসউদ আহমদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেছেন- একবার শেখ আলী বিন হায়তী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহ আনহু) এর সাথে দেখা করতে গেলেন। তখন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। আমি ওনাকে জাগাতে চাইলাম কিন্তু শায়খ আলী বাঁধা দিলেন এবং বললেন, ওয়াল্লাহ, খবরদার! হযরত শায়খ আবদুল কাদেরের কোন হাওয়ারী (ঈসা আলাইহিস সালামের সহচরকে হাওয়ারী বলা হয়) উপস্থিত নেই। যখন হযরত জাগ্রত হলেন এবং বাইরে তশরীফ আনলেন, তখন বললেন, আমি মুহাম্মদী, হাওয়ারীনতো ঈসা আলাইহিস সালামের হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলেন। শায়খ আলী বলেন, আমি আজ পর্যন্ত এ রকম আধ্যাত্মিক আলোচনা অন্য কারো মুখে শুনিনি।

শায়খ আবু মুহাম্মদ বিন আলী বিন ইদ্রিস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শায়খ শাহাবউদ্দীন সহরওয়ার্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর একটি স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করেন– তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে কিয়ামত শুরু হয়েছে। নবী ও ওলীগণ কিয়ামতের মাঠের দিকে তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পিছনে তাঁর উম্মতগণ অস্থির জলস্রোতের মত আসতেছে। ওদের মধ্যে বিশিষ্ট শায়খ ও ওলীগণও আছেন কিন্তু হযরত সৈয়্যেদেনা আবদুল কাদেরের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। আমি জিজ্ঞেস করলাম– এ বুজুর্গজন কে? আমাকে বলা হলো– তিনি হযরত শায়খ আবদুল কাদের।

শায়খ শাহাব উদ্দীন ওমর সহরওয়ার্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন– একবার আমি আমার চাচা আবুন নজীর সহরওয়ার্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সাথে জনাব গাউছে পাকের খেদমতে হাজির হলাম। আমার চাচা গাউছে পাকের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর সামনে দু'জানু হয়ে নীরবে বসে রইলেন। যখন আমি নেজামিয়া মাদ্রাসায় গেলাম, তখন আমার চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম– আপনি ওনাকে এত সম্মান কেন করছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যাকে ফিরিশতা জগতেও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তাঁকে কি করে সম্মান না করি। আল্লাহ তাআলা

আমাদেরকে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছে করলে আওলীয়ায়ে কিরামের অবস্থাদি ও মরতবা অটল রাখতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে এক দিকে নিক্ষেপ করতে পারেন।

শায়খ মূসা আলজুলী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হযরত গাউছে পাকের খুবই সম্মান করতেন। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ওনি সুলতানুল আওলীয়া এবং সৈয়্যেদুল আরেফীন। আমি ওনাকে কি করে সম্মান না করি, যার সামনে ফিরিশতাগণও সম্মান প্রদর্শন করে হাজির হয়।

শায়খ শাহাব উদ্দীন সহরওয়ার্দী বর্ণনা করেন– আমি যৌবনের প্রারম্ভে খুবই তেজী মনোভাবাপন্ন ছিলাম। যুক্তি বিদ্যা, গ্রীক দর্শন ও অন্যান্য তর্ক শাস্ত্রের প্রতি আমার খুবই আকর্ষন ছিল। আমার চাচাজান শায়খ আবুন নজীর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আমাকে প্রায় সময় এসব জ্ঞান চর্চা থেকে বাঁধা দিতেন কিন্তু আমি বিরত থাকতাম না। এক দিন তিনি আমাকে সৈয়্যেদেনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন– হে ওমর, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ দেখ, তুমি এমন এক ব্যক্তির কাছে এসেছ, যার অন্তর আল্লাহ তাআলার ভেদ-রহশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই সাবধান! ওনার সামনে খুবই আদবের সাথে বসিও, যাতে ওনার থেকে ফয়েজ-বরকত হাসিল করতে পার। অতঃপর আমরা ওনার সামনে গিয়ে বসলাম। আমার চাচাজান ওনার সমীপে আরয করলেন– হুযূর, এ আমার ভাতিজা। সে যুক্তি বিদ্যা ও দর্শনের প্রতি খুবই আকৃষ্ট। আমি অনেকবার একে বারণ করেছি কিন্তু সে এ বিদ্যা চর্চা থেকে বিরত হয় না'। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে ওমর! কোন্ কোন্ কিতাব তুমি পড়েছ এবং স্মরণ রেখেছ? আমি বললাম- অমুক অমুক কিতাব। এটা শুনার পর তিনি তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর বুলালেন। খোদার কসম, তাঁর হাত মুবারক আমার বুক থেকে সরিয়ে নেয়ার আগেই আমি ওসব কিতাবের কথা একবারে ভুলে গেলাম। ওসব কিতাবের বিষয়বস্তু আমার মেমোরি থেকে একেবারে উদাও হয়ে গেল এবং আল্লাহ তাআলা আমার আত্মাকে ইলমে লদুনী দ্বারা ভরপুর করে দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা করতে লাগলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি ইরাকের একজন প্রসিদ্ধ আলেমেদ্বীন হবে'। শায়খ শাহাব উদ্দীন ওমর সহরওয়ার্দী বলেন, শায়খ আবদুল

কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) তরীকতের বাদশাহ ছিলেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ওনার হস্তক্ষেপ প্রসারিত ছিল।

শায়খ আবু আমর মরজুকী করশী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) হলেন আমাদের শায়খ ইমাম ও সরদার। আল্লাহ তাআলা এ যুগে ওনাকে যে সব পুরস্কার ও মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্য কোন ওলীর নসীব হয়নি। এ সব পুরস্কার সমূহ হুযূর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অনুমতিক্রমে ও গাউছে পাকের মধ্যস্থতায় অন্যান্য ওলীগণের মধ্যে বন্টন করা হয়। শায়খ মাজেদ কুর্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) প্রায় সময় বলতেন যে সৈয়্যেদেনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) হলেন তরীকতের ইমাম এবং পীরানে পীর। তাঁর নূরের দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধকগণের আত্মা সমূহ আলোকিত হয় এবং তাত্ত্বিকগণের জ্ঞানভাণ্ডার তাঁরই বদৌলতে প্রসারিত হয়। যেহেতু তাঁর নূর নূরে নাবুয়াত থেকে আলোকিত ও শক্তিপ্রাপ্ত এবং বেলায়েতের সমস্ত শাখা সমূহ নূরে নব্বী থেকেই রসদ পেয়ে থাকে, সেহেতু সেই নূরে বেলায়েতের উপর নির্ভর করা ও আস্থা রাখা প্রয়োজন।

শায়খ খলীফা আকবর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, 'আমাকে স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, শায়খ আবদুল কাদের আমার কুতুব। আমি ওর কার্যাবলীর ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করি।' এ কারণেই শায়খ শাহাব উদ্দীন সহরওয়ার্দী গাউছে পাকের সেই কথার উপর জোর দিয়েছেন– ওলীর কদম নবীর কদমের উপর হয়ে থাকে এবং আমার কদম আমার মহামান্য নানা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কদমের উপর। হুযূরের কদম উঠার সাথে সাথে আমার কদম তার পদচিহ্নের উপর রাখি। আমার প্রতিটি কদম নাবুয়াতের কদমের উপর হয়ে থাকে।' এ মর্যাদা নবী ছাড়া অন্য কেউ পায় না। তবে এটা শুধু গাউছে পাকের জন্য ব্যতিক্রম ছিল। এটা জানা দরকার যে অনেক বুজুর্গানে কিরাম গাউছে পাকের শানে নানা ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য এমন কতেক গুলো ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে, যা অনির্দিষ্ট ছিল। যেহেতু তিনি ওলীকূল শিরোমনি, তাঁর শানে হযরত খিজিরের রেওয়ায়েত ছাড়াও আগে পরের অনেক রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। তাঁর ফজীলত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মাশায়েখে কিরামের উপর সমান ভাবে প্রযোজ্য। তাঁর সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি সমসাময়িক সকল আওলীয়ায়ে কিরাম জোরালো সমর্থন দিয়েছেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এ ধরনের সম্মান অন্য কোন ওলীর নসীব হয়নি। তাঁর প্রশংসা ও সুখ্যাতি এত অধিক যে বাহজাতুল আসরার ও অন্যান্য অগণিত কিতাবে বর্ণনা করে শেষ করা যায়নি। এ 'যুবদাতুল আসরার' কিতাবটি বাহজাতুল আসরারের সার সংক্ষেপ। এতে তাঁর কামালাতের কেবল উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

গাউছে পাকের বংশ পরিচয়

সৈয়দগণের সরতাজ, শায়খুল ইসলাম, ওলীকূল শিরমনী হযরত গাউছুল আযম শায়খ মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বংশগত সাজরা নিম্নরূপ–

আবদুল কাদের, ইবনে আবি সালেহ মূসা, ইবনে আবি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহিয়া যাহেদ ইবনে দাউদ ইবনে মূসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা জুন ইবনে আবদুল্লাহ মজল ইবনে হাসন মছনা ইবনে হাসন ইবনে আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন)

গাউছে পাকের নানাজান হযরত আবি আবদুল্লাহ সোমেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) যাহেদ ও তকওয়ায় খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। গাউছে পাকের জন্মের সময় তিনি জীলানে ছিলেন। জীলান বা জীল এলাকাটি তিবরিস্তানের অন্তর্ভূক্ত। কেউ কেউ বলেন গীলান বা জীলান বা গীল একটি গ্রামের নাম, যেটা দজলা নদীর তীরে অবস্থিত। এ গ্রামটি বাগদাদ শহর থেকে মাত্র একদিনের পথ। ভূতত্ত্ববিদগন এর নাম- জীলে আজম, গীলে আজম, গীলে ইরাক ও জীল লিখেছেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে 'জীলানী' লকবটি তাঁর দাদা থেকে গৃহীত, যিনি জীলানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। অনেক গীলানবাসী থেকে আমি নিজে শুনেছি যে তাঁর বংশধর এখনও গীলানে আছেন এবং ওনারা আহলে সুন্নাতের অনুসারী। গাউছে পাকের নানাজান হযরত আবু আবদুল্লাহ সোমেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) জীলানের বিশিষ্ট মাশায়েখের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি সে সময়কার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে গণ্য ছিলেন। তিনি কাশফ ও কারামাতের অধিকারী ছিলেন। ইরাকের পীর মাশায়েখ তাঁকে মুজিবুদ্দাওয়াত (যাঁর দুআ বিফল যায় না) হিসেবে বিশ্বাস করতেন। বার্দ্ধক্য কালেও তিনি অধিক নফল নামায পড়তেন, রেয়াযত, মুশাহেদায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি সব সময় আল্লাহর জিকির আসকার করতেন এবং একাগ্রচিত্তে ভয় ভীতির সাথে নামায আদায় করতেন। তিনি প্রায় সময় কোন ঘটনা ঘটার আগেই বলে দিতেন।

গাউছে পাকের মায়ের নাম ছিল উম্মুল খায়ের আমাতুল জব্বার ফাতেমা। তিনি বড় নেককার মহিলা ছিলেন। শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল লতিফ বিন শায়খ আবুন নজীব (রহমতুল্লাহে আলাইহিমা) বর্ণনা করেন– শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর মাতা হযরত উম্মুল খায়ের আমাতুল জব্বার ফাতেমা সঠিক আকীদার অনুসারী ও নেককার মহিলা ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন– "যখন শায়খ আবদুল কাদের জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি রমযানের সময় দিনের বেলায় আমার দুধ পান করতেন না। একবার রমযানের

চাঁদ দেখা নিয়ে মতবেধ সৃষ্টি হলে লোকেরা আমার কাছে এসে জানতে চাইলো যে আবদুল কাদের দিনের বেলা দুধ পান করেছে কিনা। আমি ওদেরকে বললাম- আজ আমার ছেলে দুধ পান করেনি। এতে ওনারা বুঝে গেল যে চাঁদ দেখা গেছে। এ ঘটনা দ্বারা আমার ছেলের ফযীলত ও শরাফতের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমার ছেলে কখনো রমযানের সময় দিনের বেলা দুধ পান করেনি।" তাঁর ছোট ভাই শায়খ আবু আহমদ আবদুল্লাহ (রহমতুল্লাহে আলাইহে)ও বড় আবেদ ও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর ফুফু হযরত উম্মে আয়েশা (রহমতুল্লাহে আলাইহা) বড় নেককার ও তাপসী মহিলা ছিলেন। ওনার থেকে অনেক কারামাত প্রকাশ পেয়ে ছিল। একবার জীলানবাসী মারাত্মক খরার সম্মুখীন হয়েছিল। লোকেরা বৃষ্টির জন্য অনেক প্রার্থনা করলো, এস্তেস্কার নামায পড়লো, তবুও বৃষ্টি হলো না। অবশেষে লোকেরা হযরত উম্মে আয়েশার কাছে এসে বৃষ্টি প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর গৃহের আঙ্গিনা ঝাড়ু দিলেন এবং বললেন- 'হে আল্লাহ" আমি ঝাড়ু দিয়া দিলাম, এখন পানি ছিটানো আপনার কাজ'। এটা বলার পর বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, অঝোরে বৃষ্টি হতে লাগলো। আগত লোকেরা বৃষ্টিভেজা হয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং জীলান শহরেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনহু) মাতা-পিতা উভয় দিক দিয়ে সৈয়দ ছিলেন। তিনি ওলামায়ে কিরামের পোষাক পরিধান করতেন। উটের উপর আরোহন কালে আরবী চাদর মাথার উপর দিতেন। যখন তিনি ওয়াজ করতেন, তখন উচ্চ চেয়ারে বসতেন। তাঁর সামনে গালিছা বিছানো হতো। তাঁর কথায় তেজস্বীভাব ও প্রেমাস্পদের সংমিশ্রন পরিলক্ষিত হতো। তিনি ওয়াজ শুরু করলে, অন্যরা সবাই নিশ্চুপ হয়ে যেত। তিনি কোন কিছুর নির্দেশ দিলে, লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করত। কোন ব্যক্তির দৃষ্টি তাঁর চেহারার উপর পতিত হলে অনায়াসে ওর মনে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে যেত। যখন তিনি মাথা উচু করতেন, তখন এরকম মনে হতো যে তিনি যেন সমবেত সবাইকে দেখতেছেন। জুমাবার জামে মসজিদে যাবার পথে লোকেরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং নিজেদের বিভিন্ন সমস্যার কথা ওনাকে জানাতেন। তিনি ওদের জন্য দুআ করতেন, যার ফলে ওদের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তাঁর কণ্ঠস্বর, বৈঠক ও আলোচনা যথাপযুক্ত হতো। যখন তিনি উচ্চস্বরে খুৎবা দিতেন, তখন প্রত্যেক শ্রোতা তাঁর কথা শুনতে পেতেন। যখন তাঁর হাঁচি আসতো শ্রোতারা তা শুনে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ। (আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন।) বলতেন।

একবার খলীফা আলমুসতানজাদ বিল্লাহ জামে মসজিদ সংলগ্ন একটি ভবনে

অবস্থান করছিলেন। লোকেরা যখন সমস্বরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ার হামুকাল্লাহ) বলে উঠলো, তখন তিনি তাঁর সহচরদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আওয়াজ কিসের? ওরা জানালো যে, জনাব শায়খ সৈয়েদেনা আবদুল কাদের (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হাঁচির জবাবে লোকেরা يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলছে। খলীফা এ কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন এবং মনে মনে বললেন-এ তাপস ব্যক্তির প্রতি মানুষের অন্তরে কী যে সম্মানবোধ!

তিনি ছিলেন গম্ভীর ও তেজস্বী প্রকৃতির। তিনি কথা বলার সময় অনেকে ভয়ে কাঁপতো। তিনি কোন সময় কারো প্রতি তাকালে, সে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকতো। যখন তিনি কোন স্থানে বসতেন, তাঁর খাদেমগণ তাঁর চারিদিকে অবস্থান করতেন। তাঁর যে কোন নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালিত হতো। এ রকম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

তিনি হালকা-পাতলা শরীর ও মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর বুক ছিল প্রশস্থ, দাড়ী ছিল ঘন ও লম্বা, রং ছিল লাল-সাদা মিশানো এবং ভ্রুদ্বয় ছিল সংযুক্ত। তাঁর আওয়াজ ছিল খুবই উচ্চ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। তার কথায় সীমাহীন প্রভাব ছিল। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে ফত্ওয়া প্রদান ও শিক্ষাদানে পারদর্শী হয়েছিলেন। তিনি ৪৭০ হিজরীতে জীলানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি বাগদাদে আসেন ৪৮৬ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ষোল বছর। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে তিনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেন; তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইমাম, শায়খ, আলেম ও পথ প্রদর্শকগণের সোহবত গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কুরআন ও উছুলে কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান লাভে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেসীনে কিরাম থেকে হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন। এ ভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে প্রচলিত সর্ববিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করেন। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে বেলায়েতের জগতে প্রসিদ্ধ করেন। তিনি যাহেরী ইলমে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আবির্ভূত হন। সাধারণ ও বিশিষ্ট সর্বজনের কাছে তিনি গৃহীত হন। তাঁর থেকে কারামত প্রকাশ পেতে থাকে। বেলায়েত প্রাপ্তির পর তাঁর কাছে বিশেষ স্তর গুলো উৎঘটিত হতে থাকে। তিনি পার্থিব সশ্রেব ত্যাগ করে আল্লাহর ধ্যানে গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েন এবং সত্যের সন্ধানে একান্ত ধৈর্য প্রদর্শন করেন ও নানা বিপদ আপদকে মাথা পেতে নেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষাদান ও ফত্ওয়া প্রদানে নিয়োজিত হন এবং ওয়াজ-নসীহত আরম্ভ করেন। তৎকালীন বিভিন্ন বুজুর্গানে কিরামের দরবারেও তিনি আনাগোনা করতে লাগলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সমাবেশে বিজ্ঞ আলেম, ফকীহ্ ও নেক বান্দাগণ উপস্থিত হয়ে তাঁর

মূল্যবান বাণী শুনে উপকৃত হতে লাগলেন। চারিদিক থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। ইরাকের অধিকাংশ মানুষ তাঁর হাতে তওবা করলো। বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে দীনি শিক্ষা অর্জন করে যে সব ছাত্ররা তাঁর কাছে আসতো, তারাও তাঁর অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হতো। তিনি প্রতিদিন কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ ও নাহু-চরফ পড়াতেন। প্রতি দিন জোহরের নামাযের পর কুরআনের তাফসীর করতেন। এতে তিনি হাকীকত, মারেফাত নিয়ে জ্ঞানগর্ব আলোচনা করতেন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে চুলছেড়া বিশ্লেষন করতেন। তিনি সর্ব বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তাঁর অগাধ জ্ঞানে তিনি যুগের কুতুব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলেন। তাঁর সাগরিদগণকে কথায়, কাজে, কিতাবাদি রচনায় বড় সাহায্য করতেন এবং তিনি নিজেও অনেক কিতাব রচনা করেন। এতে তাঁর সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলের কাধঁ তাঁর সামনে নত করে ছিল। তাঁর প্রশংসা প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে হয়েছিল। তিনি পিতৃ ও মাতৃকুল উভয় দিক দিয়ে সম্ভ্রান্ত হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি শরীয়ত-তরীকত উভয় দিক দিয়ে ইমাম হিসেবে বিবেচিত হন। তার নাম অতি অল্প সময়ের মধ্যে কুতুবল আফতাব ও গাউছুস সকলাইন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ কারণেই অগনিত ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এদের মধ্যে যুগের নামকরা অনেক আলেম ও বুজুর্গও ছিলেন।

বাহজাতুল আসরারের লিখক এ সব ওলামায়ে কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা সবাই কাদেরীয়া সিলসিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁরা গাউছে পাককে আন্তরিক ভাবে তাজীম করতেন। তাঁদের অন্তর গাউছে পাকের মহব্বতে ভরপুর ছিল। তাঁরা সবসময় গাউছে পাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন এবং সবাইকে গাউছে পাকের অনুসরণ করার জন্য আহবান জানাতেন।

গাউছে পাকের আওলাদ

বাহজাতুল আসরার কিতাবে গাউছে পাকের আওলাদ ও তৎকালীন অন্যান্য বুজুর্গানে কিরাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমি এখানে একান্ত সংক্ষেপে তাঁর আওলাদ সম্পর্কে আলোকপাত করার মনস্থ করেছি। আমি তাঁর ওসব আওলাদ সম্পর্কে আলোচনা করবো, যারা তাঁর ফিকহী চিন্তাধারা অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং স্বীয় যুগে বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বুজুর্গ বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণিত আছে। তাঁরা বিদ্যা বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সমান হলেও সবাই যুগের সেরা বিদ্বান ও বুজুর্গ ছিলেন। তাঁদের সকলের থেকে নানা কারামাত প্রকাশ পেয়েছিল।

গাউছে পাকের প্রথম পুত্র হযরত শায়খ সায়ফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ আবদুল ওহাব

(রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর আব্বাজান থেকে ফিকাহ শাস্ত্রে সনদ লাভ করেন। হাদীছের জ্ঞানও তাঁর আব্বাজান থেকে লাভ করেন। অবশ্য অন্যান্য ওলামায়ে মুহাদ্দেসীনের কাছেও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। জ্ঞান আহরনের জন্য তিনি আরব বহির্ভূত অনেক জায়গায় গমন করেন। তাঁর পিতার পর তিনি ওনার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদের পাঠ দান ছাড়াও হাদীছ বর্ণনা করতেন, ওয়াজ করতেন এবং ফত্ওয়া দিতেন। তিনি 'জমালে ইসলাম' উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। অনেক মাশায়েখ ও ওলামায়ে কিরাম তাঁর থেকে খেলাফতের সনদ লাভ করেন। তিনি ৫২২ হিজরীর শাবান মাসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫৭৬ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৫ তারিখ বাগদাদে ইনতেকাল করেন। তাঁর মাজারের উপর আজিমুশ্শান গুম্বজ তৈরী করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পুত্র হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবু আবদুর রহমান ঈসা (রহমতুল্লাহে আলাইহে)ও বড় আলেম ছিলেন। তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর পিতার নিয়মই অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর পিতা ও তাঁরই আনুসারী ওলামায়ে কিরাম থেকে হাদীছ শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীছের দরস দিতেন, ওয়াজ করতেন এবং ফত্ওয়াও দিতেন। তিনি তাসাউফের উপর কয়েকটি কিতাব রচনা করেন, যার মধ্যে 'জওয়াহেরুল আছরার' ও 'লতায়েফুল আনওয়ার' খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি বড় সাহেবে-কাশফ ছিলেন। তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে মিসরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে হাদীছের শিক্ষা দিতেন। তাঁর দরসগাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মিসরের অনেক ওলামায়ে কিরাম চারিদিকে জ্ঞান বিস্তার করেন। তিনি ৫৭৩ হিজরীতে মিসরে ইন্তেকাল করেন।

তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল শমসুদ্দীন আবু মুহাম্মদ। তিনি ফখরুল ওলামা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিকাহ ও হাদীস পড়েছেন এবং পিতার অনুসরণে ওয়াজ করতেন এবং কুরআন হাদীছের দরস দিতেন। সমসাময়িক অনেক বড় বড় আলেম তাঁর দরসগাহ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি খুবই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিনয়ী ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

চতুর্থ পুত্র শেখ জামাল উদ্দীন আবু আবদুর রহমান (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'মুফতীয়ে ইরাক' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনিও তাঁর পিতার কাছে ফিকাহ ও হাদীছ পড়েন এবং পরবর্তীতে শিক্ষা ও ফত্ওয়ার কাজে নিয়োজিত হন। তিনি বড় নেক তবীয়ত ও উদারমনা ছিলেন। তাঁর বক্ষ ছিল জ্ঞান পিপাসুদের বিচরন ক্ষেত্র। জ্ঞান ও ফযীলতে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

পঞ্চম পুত্র হযরত শেখ হাফেজ তাজুদ্দীন আবু বকর আবদুর রজ্জাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সিরাজুল ইরাক, ফখরুল হুফ্ফাজ ও শরফুল ইসলাম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনিও তাঁর পিতা থেকে ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি চিন্তাশীল, ধৈর্যশীল ও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দরসগাহ থেকে অনেক বিজ্ঞ আলেম সৃষ্টি হয়ে ছিল। তিনি প্রায় সময় রিয়াযত-মুশাহেদায় লিপ্ত থাকতেন। কথিত আছে যে, তিনি ত্রিশবছর কাল মুরাকেবায় ছিলেন এবং লজ্জায় ও আল্লাহর বুজুর্গীর ভয়ে একবারও আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। ৬৩২ হিজরীতে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৫২৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

ষষ্ঠ পুত্র শেখ আবু ইসহাক ইব্রাহীম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একাধারে প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফাস্সির ছিলেন। তিনিও তাঁর পিতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর থেকে অনেক ওলামায়ে কিরাম শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, বিনয়ী ও দয়ালু ছিলেন। তিনি শেষ কালে ওয়াসেতের দিকে চলে যান এবং সেখানে ৫৯২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

সপ্তম পুত্র শেখ আবুল ফজল মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে)ও বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনিও তাঁর পিতা থেকে ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ২৫শে জিলকদ ৬০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বাগদাদের জলিলা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

অষ্টম পুত্র আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ (রহমতুল্লাহে আলাইহে)ও তাঁর পিতা থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অল্প বয়সেই দীনি শিক্ষায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি হাদীসের শিক্ষা দিতেন। ২৭শে সফর ৫৬৯ হিজরীতে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

নবম পুত্র আবু জকরীয়া ইয়াহিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বড় ফকীহ ও বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি ৬ রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫ শাবান ৬০০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে তাঁর ভাই আবু আবদুল্লাহ আবদুল ওহাবের মাযারের পাশে দাফন করা হয়।

দশম পুত্র হযরত জিয়াউদ্দীন আবু নছর মূসা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সিরাজুল ফোকহা ও জয়নুল মুহাদ্দেসীন উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে ফিকাহ ও হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীতে দামেস্ক ও মিসরে হাদীছের শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। সাধারণ জনগণ তাঁর থেকে খুবই উপকৃত হয়েছিল। তিনি কিছু দিন মিসরে অবস্থান করার পর দামেস্কে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। ৬১৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং জবলে কামুসে তাঁকে দাফন করা হয়।

'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থের প্রনেতা মোল্লা নুরুদ্দীন গাউছুল আযমের পবিত্র সন্তানাদির জ্ঞান গরিমা ও দীনি খেদমত সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন যে গাউছে পাকের আওলাদ থেকে লোকেরা যে পরিমান ইলমী ফয়েজ লাভ করেছিলেন এবং তৎকালীন ওলামায়ে কিরাম যে পরিমান উপকৃত হয়েছেন. সে ধরনের কামালাত ও রূহানী ফয়ুজাত অন্য কোন বুজুর্গের আওলাদ থেকে পরিলক্ষিত হয়নি।

উপরোক্ত আলোচিত দশ সাহেবজাদার অপুর্ব শানমান ও বুজুর্গী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে 'বাহজাতুল আসরার' ও অন্যান্য কিতাব দেখুন।

বিভিন্ন স্থানে গাউছে পাকের বংশধরের বসবাস

গীলান শহরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকগণ অর্থাৎ গাউছে পাকে আওলাদ পরবর্তীতে মুলতান, লাহোর ও উছ শরীফ এসে বসবাস করেন। তাঁরা সবাই শায়খ সৈয়দ সায়ফুদ্দীন আবদুল ওহাবের বংশধর ছিলেন। তাঁরা সবাই গাউছে পাকের সত্যিকার উত্তর সূরী, সম্মানিত এবং সর্বগুনে গুনান্বিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত কলিমুল্লাহ শায়খ মূসা বিন শায়খ হামেদ গীলানী খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী) গায়েবী ইশারা ও আল্লাহর নির্দেশে আমার পিতার অনুমতি নিয়ে তাঁর আস্তানায় ধর্না দিয়েছি এবং তাঁর মুরিদ হয়ে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। তিনি তৎকালীন বাদশাহের সম্মানিত সভাসদও ছিলেন। জনৈক অবাধ্য মুরীদের হাতে তিনি শাহাদত বরন করেন এবং মুলতান শহরে সমাধিস্থ হন। অধম তাঁর শানে এ চার পংক্তি রচনা করেছিলাম।

اے دیدہ بیا جمال منظور بہ بیں

آں جبہ واں جمال وآں نوربہ بیں

در وادی ایمں محبت بگزر

ہم موسی وہم درخت ہم طوربہ بیں

অর্থাৎ হে চক্ষু, চলো, সেই সম্মোহনীময় সৌন্দর্য দেখি, সেই জ্যোতিময় কপাল ও মুখশ্রী অবলোকন করি। চলো, সেই মহব্বতের উপত্যাকায়, যেথায় দেখতে পাবে হযরত মূসার প্রতিচ্ছবি, সেই বৃক্ষ ও সেই তুর পাহাড়ের অনুরূপ দৃশ্যাবলী।

গাউছে পাকের যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান

'বাহজাতুল আসরার' এর প্রনেতা বর্ণনা করেন– শায়খুল আযল আবু মুহাম্মদ ইউসুফ বিন ইমামুল আযলী আবদুর রহিম বিন আলী যওজী বলেন– আমাকে হাফেজ আবুল আব্বাস আহমদ বলেছেন– আমি ও তোমার পিতা একদিন হযরত সৈয়্যেদেনা আবদুল কাদের জিলানীর খেদমতে উপস্থিত হই। তখন জনৈক কারী কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং গাউছে পাক এর এক বিশেষ ভাবার্থ বর্ণনা করেন। আমি আপনার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম– আপনি কি এ ভাবার্থ সম্পর্কে জ্ঞাত? তিনি বললেন– হ্যাঁ। গাউছে পাক আর একটি ভাবার্থ বর্ণনা করলেন। আমি আপনার পিতাকে সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন– হ্যাঁ, এটাও আমি জানি। তিনি এটার ব্যাখ্যাও আমাকে শুনালেন। এ ভাবে গাউছে পাক এগারটি ভাবার্থ বর্ণনা করলেন এবং আপনার পিতা এ সব সম্পর্কে জ্ঞাত বলে জানালেন। শেষ পর্যন্ত গাউছে পাক চল্লিশটি ভাবার্থ বর্ণনা করেন এবং আপনার পিতা ওগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গাউছে পাক প্রত্যেক ভাবার্থ বর্ণনা করার সময় এর বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করছিলেন। আপনার পিতা গাউছে পাকের এ অগাধ জ্ঞান দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। অতঃপর গাউছে পাক বললেন– 'আমি এখন বাহ্যিক জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে যাচ্ছি' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করলেন। এটা বলার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই অস্থির হয়ে পড়েন এবং আপনার পিতা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্বীয় কাপড় ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললেন। এটাতো যাহেরী জ্ঞানের ঘটনা। কিন্তু তাঁর বাতেনী জ্ঞান মানুষের কল্পনার বাইরে। কোন প্রশংসাকারী সেটা বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না।

একবার শায়খ বয়ায সৈয়্যেদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে হাজির হন। ঐ সময় তিনি দুধ পান করছিলেন। কিছুক্ষন বিশ্রাম করে এবং নিরব থাকার পর বললেন– আল্লাহ তাআলা আমার জন্য ইলমে লাদুনী (খোদায়ী জ্ঞান) এর সত্তর দরজা খুলে দিয়েছেন এবং প্রতিটি দরজা আসমান জমীনের সীমানা থেকেও অধিক প্রশস্ত। অতঃপর তিনি মারেফতের বিশেষ বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এতে উপস্থিত লোকেরা বেহুশ হয়ে গেল। এ ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনা তাঁর 'ওয়াজ মাহফিল' অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

প্রতিদিন মুসলিম জগত থেকে শরীয়ত সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত রায় চাওয়া হতো। এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি, যে দিন তাঁর কাছে এ রকম কোন দীনি প্রশ্ন আসেনি। তিনি প্রতিটি প্রশ্ন মনোযোগ সহকারে দেখতেন এবং তাঁর সুচিন্তিত

রায় দিতেন। তিনি ফিকহী বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মযহাব অনুসারে ফত্ওয়া দিতেন। 'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থের প্রণেতা বলেন তিনি মযহাবে মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর ইজতেহাদ (গবেষনা) কখনো শাফেঈ আবার কখনো হাম্বলী মযহাব অনুসারে হতো। তবে এটা প্রসিদ্ধ যে তিনি হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। বাগদাদের প্রায় ওলামায়ে কিরাম হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বাগদাদেই থাকতেন। তাই সেখানে তাঁর প্রভাব ছিল বেশী। তাঁর মাজারও বাগদাদে অবস্থিত। হযরত ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু)ও প্রথমে বাগদাদে থাকতেন। পরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে বাগদাদে রেখে তিনি মিসর চলে যান। জনাব গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ইমাম আযম আবু হানিফা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কতেক ফিকহী বিষয়ে ভিন্নমত পোষন করতেন। তিনি তাঁর কিতাবের অনেক জায়গায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রশংসা করেছেন।

শায়খ আবুল হাসন আলী বিন হায়তী বর্ণনা করেন– আমি হযরত সৈয়্যেদেনা শায়খ আবদুর কাদের জিলানী ও শায়খ বকা বিন বতুর সাথে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মাজার যেয়ারত করতে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম হযরত ইমাম হাম্বল স্বশরীরে কবর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং সৈয়্যেদেনা আবদুল কাদেরের সাথে কোলাকুলি করলেন এবং একটি উন্নত জামা পরায়ে দিয়ে বললেন, হে আবদুল কাদের! আল্লাহ তাআলা শরীয়ত তরীকত ও যাবতীয় আধ্যাত্মিক কার্য্যাবলীর জ্ঞান আপনার জিম্মায় সোপর্দ করেছেন।

'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থের প্রণেতা একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো– একবার গাউছে পাকের কাছে এমন একটি ফতওয়া চাওয়া হলো, যার উত্তর দিতে ইরাক ও আযম দেশের ওলামায়ে কিরাম অক্ষম ছিলেন। ফতওয়ার বিষয়টি ছিল নিম্নরূপ–

"ওলামায়ে কিরাম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার কসম করেছে এ শর্তে যে যদি সে এমন ইবাদত করতে না পারে, যেটায় পৃথিবীতে অন্য কেউ তার সাথে শরীক না থাকে।"

"এমতাবস্থায় ঐ লোকটার কোন্ ইবাদত করা উচিত এবং যদি এমন ইবাদত করতে না পারে তাহলে ওর স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে কি না।"

গাউছে পাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন যে, লোকটি অনতিবিলম্বে মক্কা শরীফ চলে যাবে এবং তওয়াফের জায়গা খালি করে একাই তওয়াফ করবে। এতে তালাক কার্যকরী হবে না।

জনাব শরীফ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন শায়খ আব্বাস বিন খিজির হোসাইনী মুসলী বর্ণনা করেন- আমার পিতা বলেছেন- আমি স্বপ্ন দেখলাম যে গাউছে পাকের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের মাদ্রাসার বিশাল চত্বরে জল ও স্থলের সমস্ত মাশায়েখ সমবেত হয়েছেন। শেখ মুহিউদ্দীন জিলানী একটি উচ্চ আসনে উপবেশন করেছেন। প্রত্যেক ওলীর মস্তকে পাগড়ী শোভা পাচ্ছিল এবং পাগড়ীর উপর একটি মনোরম ফিতা ছিল, কতেক ওলীর পাগড়ীর উপর দু'ফিতা ছিল। গাউছে পাকের পাগড়ীর উপর তিন ফিতা শোভা পাচ্ছিল। আমি এ রকম দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলাম হযরত খিজির আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন, এ তিন ফিতা হলো- ইলমে শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকতের।

মুহিউদ্দীন নামকরণ হওয়ার কারণ

কাদেরীয়া সিলসিলার মাশায়েখে কিরাম বর্ণনা করেন- লোকেরা গাউছে পাকের কাছে 'মুহিউদ্দীন' নামের মাহাত্ম্য জানতে চাইলে, তিনি বলেন, আমি একবার এক দীর্ঘ সফর শেষ করে বাগদাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমার পায়ে কোন জুতা ছিল না। পথে এক অসুস্থ লোকের দেখা হলো, যার চেহারা ছিল ফ্যাকাশে এবং শরীর ছিল শীর্ণকায়। সে আমাকে সালাম করলো, আমি 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' বললাম। সে আমাকে ওর কাছে ডাকলো। আমি কাছে গেলে সে বললো- আমাকে উঠাও। আমি ওকে উঠিয়ে বসালাম। তখন ওর শরীরটা ভাল দেখাচ্ছিল এবং চেহারাটাও উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো- তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি 'না' বললাম। তখন সে বলতে লাগলো- আমি তোমাদের ধর্ম। আমি জীর্ণ-শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমাকে নবজীবন দান করেছেন। আজ থেকে তোমার নাম হবে 'মুহিউদ্দীন'। যখন আমি জামে মসজিদের দিকে ফিরে আসলাম, তখন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো এবং সে আমাকে 'হে সৈয়দ মহিউদ্দীন' বলে সম্বোধন করলো। নামায আদায় করার পর দেখলাম লোকেরা আদব সহকারে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং আমার হাতে চুমু দিতে লাগলো আর মুখে 'ইয়া সৈয়দ মুহিউদ্দীন' বলতে লাগলো, অথচ ইতোপূর্বে কেউ আমাকে এ নামে সম্বোধন করেনি।

তরীকায়ে রূহানিয়াত

নৈকট্য লাভ, সলুক অর্জন, রেয়াজত, মুজাহেদা, তাজকিরায়ে নফস (নফসের পবিত্রতা) তসফিয়ায়ে কলব (কলবের পরিচ্ছন্নতা) তাখলিয়ায়ে রূহ (আত্মার পরিশোধন) ফনাফিল্লাহ ও বকাবিল্লাহ অর্জন, মোট কথা আন্তরিক অবস্থান ও আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার

বদৌলতে যা অর্জিত হয়, তাকে তরীকা বলা হয়। আমার শায়খ আবু মুহাম্মদ আলী বিন ইদ্রিস ইয়াকুবী আমাকে বলেছেন যে লোকেরা শায়খ আলী বিন হায়তীর কাছে হযরত মুহিউদ্দীন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহ আনহু) এর তরীকায়ে রূহানিয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বলেন- তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ খোদার দিকে ধাবিত ছিল। একাকিত্ব ও নির্জনে খোদার ধ্যান ছিল তার তরীকা এবং তিনি বারগাহে ইলাহীতে অবুদিয়াতের স্থানে অটল ছিলেন। এ অবুদিয়াতের স্থানটি কোন কিছুর জন্য বা কোন কিছুর সম্পর্কের জন্য ছিল না বরং এটা কমালে রবুবিয়াতের কারণে ছিল। তিনি এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, ভিন্নতার বেড়াজাল থেকে অনেক উর্ধে উঠে আহকামে শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরন করে রূহানী সাধনায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শায়খ আদি বিন মুসাফিরের কাছে হযরত গাউছুল আযমের তাসাউফের তরীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন- মনে-প্রাণে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন সম্বন্বয়ে রেয়াজতে খোদাওন্দী দ্বারা দুর্বল হয়ে যাওয়া, নফসের সমস্ত আচরণকে বিসর্জন দিয়ে খাহিশাতে নফসানী থেকে মুক্ত হওয়া এবং সমস্ত লাভ-ক্ষতি, দুরত্ব-নৈকট্য একমাত্র আল্লাহর জন্য গ্রহণ করাই ছিল তাঁর তরীকা। শায়খ বকা বিন বতু (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানীর কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সম্বন্বয় ছিল, নফস ও কলব এক সাথে চলতো এবং এখলাস ও বশ্যতা এক সাথে কাজ করতো। এ সমস্ত ক্ষমতা কিতাব ও সুন্নাহের আনুগত্য ছিল। প্রত্যেক সমস্যায়, প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করতেন।

শায়খ আবুল ফরাহ আবদুর রহীম বলেন- আমি বাগদাদে গমন করে গাউছে পাকের খেদমতে হাজির হয়েছি। আমি তাঁকে সাহেবুল হাল (আধ্যাত্মিক ধ্যানী) ও ফারেগুল কলব (আত্মহারা হৃদয়ের অধিকারী) পেরেছি। তাঁর মস্তিষ্ক আল্লাহর ধ্যান ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে খালি ছিল। একটি বিষয় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা জানার জন্য আমি ওবাইদার মার কাছে গেলে শায়খ রেফায়ীর সাথে দেখা হয়। তিনি আমার খালু হন। আমি তাঁকে শায়খ আবদুল কাদেরের দরবারের প্রাথমিক প্রভাবের কথা শুনালে, তিনি বলেন- বেটা, এ সময় পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে শায়খ আবদুল কাদেরের মুকাবিলা করতে পারে। যে স্তরে শায়খ পৌছেছেন এবং তিনি যে রূহানী শক্তির অধিকারী হয়েছেন, তা অন্য কারো ভাগ্যে নসীব হয় নি।

শায়খ আরেফ আবুল হাসন আলী করশী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে লোকেরা হযরত শায়খ জিলানী সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বলেন- তাঁর রূহানী শক্তি ছিল সমস্ত ওলীগণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী। তাঁর তরীকা ছিল পরিপূর্ণ তৌহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর যাহেরী-বাতেনী যাবতীয় বিশ্লেষন ছিল শরীয়ত ভিত্তিক। তাঁর

অন্তর ছিল দুনিয়াবী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত এবং খোদায়ী সৃষ্টি রহস্য দর্শনে নিমর্জিত। রুহানী জগতের প্রধান কর্তৃত্ব তাঁর অধীনে করে দেয়া হয়েছিল।

গাউছে পাকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া

শায়খ আরিফ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবুল ফাতাহ আল-হারুরী বর্ণনা করেন– আমি পূর্ণ চল্লিশ বছর গাউছে পাকের খেদমতে ছিলাম। এ সুদীর্ঘ সময়ে আমি তাঁকে এশার নামাযের অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করতে দেখেছি। তৎকালীন বাগদাদের বাদশাহ তাঁর সাথে দেখা করার জন্য কয়েকবার রাত্রে এসেছিলেন। কিন্তু ইবাদতে মগ্নতার কারণে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। আমি কয়েক রাত তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে দেখেছি যে তিনি রাতের প্রথম ভাগে নামায সংক্ষেপে পড়ে যিকিরে নিয়োজিত হতেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হতো তিনি বলতেন–

اَلْمُحِيْطُ الْعَالِمُ الرَّبُّ الشَّهِيْدُ الْحَسِيْبُ الضَّالِ وَالْخَلَّاقُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

এরপর দেখতাম, তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে যেত। কোন কোন সময় তাঁর শরীর খুবই ছোট হয়ে যেত, আবার কোন কোন সময় অনেক বড় দেখাতো। কোন সময় তাঁর শরীর বাতাসে উড়তো এবং অদৃশ্য হয়ে যেত। আবার কোন সময় নামায পড়তে দেখা যেত। তাঁর অদৃশ্য হওয়ার সময়টা ছিল রাতের তৃতীয় ভাগের শেষাংশে।

তিনি নামায পড়ার সময় সিজদা দীর্ঘ করতেন এবং স্বীয় মুখ মাটির সাথে লাগাতেন। অতঃপর বসে মুরাকেবা করতেন। তখন তাঁর শরীর উজ্জ্বল আলোক রশ্মিতে এমন ভাবে ঢেকে যেত যে তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন এবং সেই নুরানী আলোকরশ্মির দিকে তাকানো যেত না। মাঝে মধ্যে আমি 'সালাম, সালাম' শব্দ শুনতাম এবং তিনি 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' বলতেন। এ ভাবে রাত অতিবাহিত করে তিনি ফজরের নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।

অদৃশ্য ব্যক্তি ও জ্বীনদের আগমন

হযরত গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বয়ং বলেছেন– আমি পঁচিশ বছর ইরাকের জংগলে রিয়াজত করে অতিবাহিত করেছি। আমি লোকদেরকে চিনতাম কিন্তু ওরা আমাকে চিনতো না। আমার কাছে অদৃশ্য ব্যক্তি ও জ্বীনেরা আসতো। আমি তাদেরকে খোদা প্রাপ্তির পথ দেখিয়ে দিতাম। চল্লিশ বছর যাবত আমি এশার অযু নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছি। পনের বছর আমি এশার নামাযের পর এক পায়ে

দাঁড়িয়ে কুরআন খতম করেছি। আমার হাত দেয়ালে হুকের মত আবদ্ধ থাকতো, যাতে ঘুম না আসে। এ অবস্থায় সেহেরীর আগে পূর্ণ কুরআন খতম করে ফেলতাম। কোন কোন সময় তিন দিন থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার খেতাম না। কোন সময় স্বপ্নে এমন আকৃতি সমূহ দেখা যেত, যেগুলোকে আমি জোরে ডাক দিলে অদৃশ্য হয়ে যেত। কোন কোন সময় দুনিয়া তার যাবতীয় আরাম আয়েশের সাথে আমার সামনে উপস্থিত হতো। আমি এমনভাবে ধমক দিতাম, সে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যেত। আমি পূর্ণ এগার বছর একটি বোর্জে (গুম্বজ বিশিষ্ট ঘর) অবস্থান করেছিলাম। পরবর্তীতে আমার অবস্থানের ফলে সেই ঘরের নাম হয়েছিল 'বোর্জে আজমী'। মাঝে মধ্যে এ রকম হতো যে আমি আমার প্রভূর সাথে অঙ্গীকার করতাম যে আমি ঐ পর্যন্ত খাব না, যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে তিনি খাওয়াবেন না বা পান করাবেন না। এ রকম অবস্থায় একবার আমি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ছিলাম। চল্লিশ দিন পর এক ব্যক্তি এসে আমার সামনে কিছু খাবার রেখে চলে গেল। মারাত্মক ক্ষুধার তাড়নায় খাবারের দিকে হাত এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু স্বীয় অঙ্গীকারের কথা স্মরণ হওয়ায় হাত ফিরায়ে নিলাম। তখন ক্ষিধার অস্থিরতায় পেট থেকে 'ক্ষুধা ক্ষুধা' আওয়াজ বের হচ্ছিল। আমি সেই আওয়াজ কেও কোন পাত্তা দিইনি। সেই সময় আমার কাছে শায়খ আবু সাঈদ মাখযুমী (কুঃ সিঃ) তশরীফ আনলেন। তিনি আমার পেটের সেই আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন– হে আবদুল কাদের, এটা কিসের আওয়াজ? আমি আরয করলাম– হুযূর, এটা আমার নফসের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার শোরগোল। তবে আমার রূহ আল্লাহর ধ্যানে শান্তিতে আছে। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, চল, বাবে আজমের দিকে যাই। ওখানে গিয়ে আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। এরপর হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে আসলেন এবং বললেন– উঠ, এবং আবু সাঈদ মাখযুমীর কাছে চলো। আমি যখন ওনার কাছে গেলাম, তখন আমার সামনে খাবার পেশ করা হলো। আমি জিজ্ঞেস কললাম– হুযূর, আমাকে খাবার কে দিচ্ছে? তিনি বললেন, এ খাবার আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন। অতঃপর তিনি আমাকে এতটুকু খাওয়ালেন যে এতে আমি পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম। তৎপর তিনি আমাকে নিজ হাতে খেরকা (খেলাফতের জামা) পরালেন। সেই খেরকা পরে আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিছু দিন পর আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি আসলেন, যাকে আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সংসর্গ কামনা কর। আমি বললাম, হ্যাঁ, কামনা করি। তিনি বললেন, তবে এ শর্তে যে আমার বিরোধীতা করতে পারবে না। আমি বললাম ঠিক আছে, তাতে রাজি। তিনি বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে বসে থেকো। আমি পূর্ণ এক বছর ঐ জায়গায়

অবস্থান করলাম। এক বছর পর তিনি এসে আমাকে সেই জায়গায় পেলেন। আমার পাশে কিছুক্ষন অবস্থান করে আমাকে অন্য কোথাও না যাবার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। এ রূপ তিন বার করলেন। শেষ বার যখন আসলেন তখন ওনার সাথে রুটি ও দুধ ছিল এবং আমাকে ওনার পরিচয় দিয়ে বললেন- আমি খিজির, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে এ খাবার যেন তোমাকে খাওয়াই। আমি ওনার সাথে বসে সেই খাবার খেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, এবার বাগদাদে চলে যাও। যখন বাগদাদে ফিরে আসলাম, আমার শায়খ জিজ্ঞেস করলেন- তুমি এ তিন বছর যাবত খাবার কোথা থেকে খেতে? আমি বললাম, যে সব জিনিস বাহ্যিকভাবে মাটিতে ফেলে দেয়া হতো, আমার নফস সে গুলো দেখে খাওয়ার জন্য আগ্রহ করতো, কোন সময় রাগে আমার সাথে ঝগড়া করতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব সময় আমাকে খাহিশাতে নফসানীর উপর কামিয়াবী দান করেছেন।

শয়তানের হামলা প্রতিহতকরণ

গাউছে পাক থেকে বর্ণিত- আমার কাছে মাঝে মধ্যে শয়তানের দল নানা আকৃতিতে আসতো এবং নানা প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমন করার উদ্যোগ নিত এবং আমার দিকে অগ্নিবর্শ নিক্ষেপ করতো। কিন্তু আমার মনে এত যে ধৈর্য ছিল, যা বর্ণনাতীত। আমি আমার অভ্যন্তরে কোন এক অদৃশ্য আহবানকারীকে এ বলতে শুনতাম 'হে আবদুল কাদের, অটল থেকো, আমি তোমাকে অটল করে দিয়েছি। আমি দেখতাম যে শয়তানের দল আমার আশপাশ ও ডান বাম থেকে পালিয়ে যেত। যে দিক থেকে আসতো, সেদিকে চলে যেত। কোন কোন সময় শয়তানদের মধ্যে থেকে কেউ একাকী আসতো এবং বলতো- উঠ এবং ওখানে চল, অন্যথায় আমি এ করবো, সে করবো, এ ভাবে আমাকে ধমক দিতো ও ভয় দেখাতো এবং সীমাহীন ভয়াল পবিবেশ সৃষ্টি করতো। আমি ওর মুখে চড় মারলে পালিয়ে যেত এবং 'লা হাউলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আজীম' পড়লে সে জ্বলে যেত।

শয়তানের প্রতারণা ও চালবাজি

গাউছে পাক বলেন- আমি দেখলাম, একবার শয়তান আমার থেকে একটু দূরে বসে কাঁদতেছে এবং স্বীয় মস্তকে ধূলা নিক্ষেপ করছে আর বলছে- "হে আবদুল কাদের! তুমি আমাকে নিরাশ করলে"। আমি বললাম- হে অভিশপ্ত! দূর হও। আমি সব সময় তোমার পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা করে থাকি। সে বললো- এটা আমার প্রতি বড় শক্ত কথা। তবে আমার কাছে কয়েক প্রকারের ফাঁদ আছে। যার মধ্যে শিরক ও কুমন্ত্রনার ফাঁদও রয়েছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম- এটা কোন্ ফাঁদ? সে

বললো- এটা দুনিয়াবী লালসার ফাঁদ, যেটাতে আপনার মত লোকদের আটকানো যায়। আমি শয়তানের এ ধরনের চালবাজির ব্যাপারে এক বছর পর্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখলাম। শেষ পর্যন্ত দুনিয়াবী লালসার সিলসিলা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর দুনিয়াবী নানা জিনিস পত্রের লালসা আমার চারিদিকে সন্নিবেশিত করলো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সব কি? সে বললো- এ সব দুনিয়াবী জিনিসপত্র, যা আপনার চারিদিকে পুঞ্জিভূত করা হয়েছে। আমি পূর্ণ এক বছর ওসব জিনিসপত্রের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখলাম। শেষ পর্যন্ত এ সব জিনিস পত্রের বাসনা দূরীভূত হয়ে গেল এবং আমি ওগুলো থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। অতপর আমার অন্তরে অনেক বিষয় পুঞ্জিভূত হতে লাগলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ গুলো কি? আমাকে বলা হলো যে এ গুলো আকাংখা ও ইখতিয়ার সমূহ। এ বিষয়ের উপরও এক বছর মনোনিবেশ করার পর আমার থেকে দূরীভূত হয়ে গেল এবং ওসব বিষয় থেকে আমার অন্তর মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর আমার নফসকে আমার সামনে পেশ করা হলো। আমি দেখলাম যে নফসের সমস্ত দুঃখ ও বাসনা সমূহ জীবিত হয়ে গেছে। আমি এ বিষয়ে পূর্ণ এক বছর মনোনিবেশ করার পর নফসের সেই দুঃখ-কামনা সমূহ দূর হয়ে গেল এবং আমার প্রতিটি কাজের উপর আল্লাহর বশ্যতা প্রতিষ্ঠিত হলো। তৎপর আমি একাকী হয়ে গেলাম এবং অন্যান্য সব কিছু পিছনে রয়ে গেল। এরপরও আমি আমার মনজিলে মকসুদে পৌছতে পারলাম না। এমন কি ভরসার দরজা দিয়ে মনজিলে মকসুদে-পৌছতে চেষ্টা করলাম। এ পথে বড় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হলো। পুনরায় শোকবের দরজা হয়ে তসলী (বশ্যতা) এর দরজা দিয়ে অগ্রসর হলাম এবং ফনাফিল্লাহের দরজা অতিক্রম করে নৈকট্য লাভের দরজা পর্যন্ত পৌছে গেলাম এবং সেখানে থেকে মুশাহেদার দরজা পর্যন্ত গেলাম। প্রতিটি দরজা অতিক্রম করতে ভীষণ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সব স্তর অতিক্রম করার পর ফকিরীর দরজায় পৌছলাম। সেটা তখন খালি ছিল। একটু সম্মুখে অগ্রসর হলে ওসব বিষয় আমার দৃষ্টি গোচর হলো, যা আমি অতিক্রম করে এসেছি। আমার সামনে বৃহৎ ভাণ্ডার খুলে দেয়া হলো। ওখানে আমি অতি সম্মান পেলাম এবং নির্মল স্বাধীনতা অর্জিত হলো। দুনিয়াবী সমস্ত কামনা-বাসনা ধ্বংস করে দেয়া হলো, যাবতীয় গুনাবলী রদ করে দেয়া হলো। আলহামদুলিল্লাহ, কেবল স্বত্বাগত অস্তিত্বই বাকী রইলো।

শয়তানী আলো আঁধারে পরিণত ঃ শায়খ জিয়াউদ্দীন আবু নছর মূসা বিন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত-তাঁর পিতা বলেছেন- একবার আমি সফরে বের হতে একটু দেরী করায় কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। পথে পানি পাওয়া যাচ্ছিল না এবং আমার ভীষণ তৃষ্ণা লেগেছিল। আমি দেখলাম যে আমার মাথার উপর এক টুকরা মেঘ এসে আচ্ছাদিত করলো এবং সেই মেঘ থেকে কিছু একটা নিচে পড়তে দেখা যাচ্ছিল। এরপর দেখলাম একটি আলো

উদ্ভাসিত হলো, যার আলোকে ধরনীর প্রান্তসীমা আলোকিত হয়ে গেল এবং সেই আলোর মধ্যে একটি আকৃতি আমার সামনে ফুটে উঠলো, যেটা আমাকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বললো– হে আবদুল কাদের। আমি তোমার প্রভু। তোমার জন্য সমস্ত হারাম জিনিসকে হালাল করে দিলাম। এখন তুমি যেটা ইচ্ছে সেটা খেতে পার। আমি তখন 'আউযু বিল্লাহ মিনাশ শয়তানির রাজিম' পড়লাম এবং উচ্চস্বরে বললাম, হে অভিশপ্ত শয়তান! দূর হও। তখন সেই আলো আঁধারে পরিণত হয়ে গেল এবং সেই আকৃতি ধুঁয়া হয়ে গেল এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললো, হে আবদুল কাদের! তোমার জ্ঞান আজ তোমাকে রক্ষা করলো এবং তোমার অপূর্ব বিতর্ক শক্তি আমাকে পরাস্ত করলো, অথচ আমি আজ পর্যন্ত সত্তর জন তরীকতের ওলীকে এ রূপ ঘটনা দ্বারা গুমরাহ করেছি। আমি বললাম– আমাকে আমার জ্ঞান ও বিতর্ক শক্তি নয় বরং আমার আল্লাহর করুনাই আমাকে রক্ষা করেছে।

আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়ে ছিল যে, আমি এটা কি করে বুঝেছিলাম যে এটা শয়তানের চালবাজি। আমি তখনই বুঝতে পারলাম যে এটা বড় শয়তান, যখন আমাকে বলা হল- তোমার জন্য সমস্ত হারাম বস্তু হালাল করে দেয়া হলো।

বগদাদ থেকে শোস্তর শহর গমন ঃ শায়খ আবুল কাসেম ওমর বিন মছউদ বজ্জাজ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন– আমি হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি "প্রথমাবস্থায় আমি যে সব আধ্যাত্মিক অবস্থার সম্মুখীন হতাম, ওগুলো বুঝার জন্য খুবই তাড়াহুড়া করতাম কিন্তু এ সবের পরিনতি সম্পর্কে জানতাম না। যখন পর্দা অপসারিত হয়ে গেল, তখন এ সব অবস্থাদি আমার কাছে সহজ হয়ে গেল। একবার আমাকে অনেক দূরের এক জায়গায় যাবার কথা ছিল। আমি বাগদাদের একটি বিরান ভূমিতে ছিলাম। কিন্তু এক মূহুর্তের মধ্যে আমি শোস্তর শহরে পৌছে গেলাম। অথচ বাগদাদ থেকে এর দূরত্ব ছিল বার দিনের পথ। আমি এ অঘটনের জন্য যখন খুবই চিন্তাযুক্ত হলাম, তখন আমার সামনে এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তিনি বলছিল, এ ঘটনা তোমার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে অথচ তুমি হলে শায়খ আবদুর কাদের।

হযরত বড় পীর সাহেবের শরীরে মাছি বসতো না

শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাজর বিন আবদুল্লাহ হোসাইনী মোছেলী রেওয়ায়েত করেন– আমার পিতা আমাকে বলেছেন– আমি শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে তের বছর নিয়োজিত ছিলাম। আমি কোন দিন তাঁর নাক বা গলা দিয়ে পানি বের হতে দেখিনি এবং এ তের বছরের মধ্যে

কোন দিন তাঁর শরীরে মাছি বসতে এবং কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সম্মানার্থে তাকে দাঁড়াতে দেখিনি। আমি অনেক বাদশাহকে তাঁর দরবারে আসতে দেখেছি, তাঁরা তাঁর সাথে চাটাইতে বসতেন। তাঁকে কোন সময় কারো সাথে খাবার খেতে দেখিনি।

একবার তিনি তৎকালীন বাগদাদের খলিফাকে লিখলেন– আবদুল কাদের তোমাকে এ নির্দেশ দিচ্ছে, তোমার জন্য এটা পালন করা জরুরী। এ নির্দেশ বাদশাহর কাছে পৌছলে, তিনি তা পরিপূর্ণ ভাবে পালন করেন।

বর্ণিত আছে, একবার তাঁর খেদমতে এক উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী এসেছিল। এর আগে সে আর কখনও আসেনি। তিনি ওকে লক্ষ্য করে বললেন- আহ! তুমি সৃষ্টি না হলে ভাল হতো। যখন সৃষ্টি হয়ে গেছ, তখন তোমার এটা জানা উচিত যে তোমার সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্য কি? ওহে অসলতার নিদ্রায় নিমগ্ন! জাগ্রত হও, স্বীয় চক্ষুদ্বয় খুলো এবং মনোযোগ সহকারে দেখ তোমার সামনে কি? তোমার খবর নেই যে আজাবের সৈন্যদল তোমার সামনে এসে গেছে। তুমি পরিবেষ্ঠিত, অধঃপতিত এবং মৃত্যুর দুয়ারে উপনিত। কয়েক বছরতো অতিবাহিত হয়ে গেল। তোমার কানে কি আমার একটি কথাও পৌছেনি? তুমি নিশ্চয় জান, এ দুনিয়া তোমার মত কত সম্পদশালী ব্যক্তিকে ধরাশায়ী করে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। খোদা পর্যন্ত পৌছার জন্য মাত্র দুটি কদম– একটি নফসের কদম, অপরটি সৃষ্টির কদম। যদি এ দু'কদম আয়ত্তে আনা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত অনায়াসে পৌছা যায়।

এ কথা গুলো বলে তিনি মিম্বর থেকে নিচে নেমে আসলে তাঁর এক সাগরীদ আরয করলেন, হুযূর ওনাকে এত কড়া কথা বলার রহস্য কি? তিনি বললেন, এক মাত্র এ কারণে যে- আমার কথাগুলো নূর বিশেষ, যা অন্তরের কালিমাসমূহ দূরীভূত করে।

বর্ণনাকারী বলেন, এর পর থেকে সেই রাজ কর্মচারী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার মজলিসে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন এবং একান্ত বিনীত ও করজোরে বসে থাকতেন।

গাউছে পাকের কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল- কোন্ জিনিস দ্বারা আপনার কাজ প্রতিষ্ঠিত হয়? তিনি বললেন– "সত্যবাদিতার দ্বারা; আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি"। সেই ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ- গাউছে পাক তাঁর আম্মাজানের কাছে বাগদাদ যাবার অনুমতি চাইলে, তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং ওনার জামার ভিতরে চল্লিশটি স্বর্ণ মুদ্রা সেলাই করে দেন। পথে ডাকাত দলের হাতে আক্রান্ত হন এবং মায়ের নসিহত মুতাবেক সত্য কথা বলে ওদেরকে তওবা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ডাকাত দলের তওবা তাঁর জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

এটাও বর্ণিত আছে যে- গাউছে পাকের কোন ছেলে বা মেয়ে মারা গেলেও তিনি ওয়াজ নসীহতের সিলসিলা বন্ধ করতেন না। লোকেরা জানাজা নিয়ে আসলেই তিনি মিম্বর থেকে নেমে জানাযার নামায আদায় করতেন।

জনাব গাউছুল আযম শীতের ঠান্ডা রাত্রেও একটি মাত্র কোর্তা গায়ে দিতেন এবং প্রায় সময় দেখা যেত যে শীতের মধ্যেও তাঁর শরীর থেকে ঘাম বের হতো এবং মুরীদগণ পাখা করতো।

ওয়াজের মজলিসে সাপ

একবার তাঁর মসলিসে দেশের প্রসিদ্ধ ফকিহ ও বিশিষ্ট আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি অদৃষ্টের মাসৃআলা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ ছাদ থেকে একটি বড় সাপ মজলিসে পতিত হলে, উপস্থিত সবাই ভয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু গাউছে পাক বসে রইলেন। সাপ তাঁর কাপড়ের ভিতর ঢুকে শরীরের চারি দিকে চক্কর দিয়ে কাপড়ের কলারের দিক দিয়ে বের হয়ে তাঁর গলায় বেড় দিল। এরপরও তিনি তাঁর আলোচনা বন্ধ করলেন না এবং স্বীয় জায়গা থেকে নড়লেন না। অতপর সাপ তাঁকে ছেড়ে মাটিতে নেমে আসলো এবং লেজের উপর দাঁড়িয়ে এমন ভাবে কথা বললো, যা আমরা কখনো শুনিনি। তারপর সাপ বের হয়ে গেল। লোকেরা ফিরে আসলে তিনি বললেন, সাপ আমাকে বলেছে যে সে এ ভাবে অনেক ওলীকে পরীক্ষা করেছে কিন্তু আমার মত কাউকে অটল পায়নি। আমি সাপকে বলেছি যে তুমি আমার উপর ঐ সময় পতিত হয়েছ যখন আমি অদৃষ্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তুমি একটি নগন্য পোকা থেকে অধিক ক্ষমতা রেখ না, যাকে অদৃষ্ট পরিচালিত করে। আমি মনে মনে স্থির করে নিয়ে ছিলাম যে আমার কাজ যেন আমার কথার ব্যতিক্রম না হয়।

জনাব গাউছে পাক বলেন, ওয়াজে প্রাথমিক অবস্থায় সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের বারনটাই আমার ওয়াজে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মাঝে মধ্যে আমার মনে এত কথা জমা হয়ে যেত, যার ফলে নিশ্চুপ থাকাটা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। প্রথম প্রথম দু'তিন জন আমার বক্তব্য শুনতো। পরবর্তীতে মানুষ বাড়তে লাগলো। অল্পদিনের মধ্যে মানুষের ঢল পড়ে গেল। এমন এক সময় আসলো খলীফার শাহী দরজার সামনে জায়নামায বিছায়ে ওয়াজ করতে লাগলাম। সেখানেও স্থান সংকুলান হলো না। শেষ পর্যন্ত শহরের বাইরে এক বিরাট ময়দানে মিম্বর স্থাপন করা হলো। লোকেরা গাধা, ঘোড়া ও উটে আরোহন করে দূরদূরান্ত থেকে আমার ওয়াজ শুনার জন্য আসতো এবং একাগ্রচিত্তে ওয়াজ শুনতো। কোন কোন সময় প্রায় সত্তর হাজারের মত লোক জমায়েত হতো।

সরকারে দোজাহান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র থুথু নিক্ষেপন

শায়খ আবদুল ওহাব, শায়খ আবদুর রজ্জাক ও ওমর বিন কিমানী (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) বর্ণনা করেন- আমরা শায়খ আবদুল কাদের (রাদি আল্লাহু আনহু) কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এটা বলতে শুনেছি- "একবার রসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আমার দীদার হয়। তিনি আমাকে বললেন- বেটা, তুমি ওয়াজ কেন কর না? আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলল্লাহ, আমি হলাম আজমী (অনারবী) বাগদাদের আরবী জ্ঞানী গুনীদের সামনে কি করে ওয়াজ করার সাহস করতে পারি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে মুখ খুলতে বললেন। আমি মুখ খুললে তিনি আমার মুখে সাত বার পবিত্র থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন- লোকদের কাছে আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পৌছাতে থাকো। আমি সে দিন থেকে যোহরের নামাযের পর ওয়াজ করতে শুরু করলাম। অনেক লোক জমায়েত হলো। তবে আমার শরীর কাঁপছিল। সেই সময় হযরত আলী (কাররামাল্লাহু আজহাহু) কে আমার সামনে উপস্থিত দেখলাম এবং আমাকে বলছেন- তোমার মুখ খুল। আমি মুখ খুলতে তিনি আমার মুখে ছয়বার থুথু নিক্ষেপ করেন। আমি আরয করলাম- সাত বার কেন নিক্ষেপ করলেন না? তিনি বললেন- রসূলে খোদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে একবার কম নিক্ষেপ করলাম"- এ বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারপর গাউছে পাক বললেন- চিন্তার ডুবুরী হৃদয়ের মহাসমুদ্রে মুক্তার সন্ধানে নিয়োজিত হয়েছে এবং হৃদয় সাগর থেকে মনিমুক্তা বের করে এনে ওয়াজকারী মুখকে হস্তান্তর করছে। এ সব মনিমুক্তা অন্তরের অন্তস্থলে রাখা হয়, যা একান্ত আনুগত্যের বিনিময়ে ক্রয় করা হয়। মাশায়েখে কিরাম বলেন- গাউছে পাক সর্ব প্রথম মিম্বরে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত কথাটুকুই বলেছিলেন।

গাউছে পাকের সাহেবজাদা ইমাম আবু বকর আবদুল আজিজ বর্ণনা করেন- আমাকে শায়খ আবুল হাসন আলী বিন হায়তী বলেছিলেন- যখন আমার আব্বা হুযূর মিম্বরের উপর বসতেন এবং আল-হামদুলিল্লাহ বলতেন, তখন ধরা পৃষ্ঠের সমস্ত ওলী উল্লাহ নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। তাঁরা মজলিসে থাকুক বা মজলিস থেকে অনেক দূরে থাকুক, সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিরবতা অবলম্বন করতেন। তিনি বার বার যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে নিশ্চুপ হতেন, তখন ওলী উল্লাহ ও ফিরিশতাগণ তাঁর মজলিসে সমবেত হয়ে যেতেন। হাজার হাজার ওলী উল্লাহ ও ফিরিশতা এ রকম অবস্থায়

মজলিসে উপস্থিত থাকতেন, যাদেরকে বাহ্যিক চোখে দেখা যেত না। ও সব অদৃশ্য শ্রোতাদের সংখ্যা দৃশ্যমান শ্রোতাদের থেকে কয়েকগুণ বেশী হতো। সেই মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাদের উপর আল্লাহর রহমতের এমন বৃষ্টি বর্ষিত হতো, যা বর্ণনাতীত।

শায়খ আবু জকরীয়া ইয়াহয়িয়া বিন নছর বিন ওমর বাগদাদী ছখরাতী বর্ণনা করেন- আমার আব্বাজান থেকে শুনেছি যে তিনি একবার তাবীজের সাহায্যে জ্বীনদেরকে তলব করলেন। কিন্তু ওরা আসতে একটু দেরী করলো এবং এসে বললো, যখন সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের ওয়াজ করেন, তখন আমাদেরকে তলব করবেন না, কেননা আমরা ওনার মজলিসে উপস্থিত থাকি। আমাদের মধ্যে অনেক জ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ওনার হাতে তওবা করেছে।

শায়খ আবু হাফ্স ওমর বিন হোসাইন বিন আতসী বর্ণনা করেছেন- আমাকে সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেছেন- হে ওমর! আমার মজলিস থেকে দূরে থেকো না। কেননা এখানে বেলায়েতের পোষাক বণ্ঠন হতে থাকে। সে ব্যক্তি বড় দুর্ভাগা, যে এ মজলিস থেকে বঞ্চিত থাকে। শায়খ ওমর আরও বর্ণনা করেন, অনেক দিন যাবত আমি মজলিসে উপস্থিত থাকতে লাগলাম। একদিন মজলিসে বসাবস্থায় আমার ঘুম এসে গেল। আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আসমান থেকে লাল ও সবুজ পোষাক অবতীর্ণ হচ্ছে এবং মজলিসে উপস্থিত সবাইকে পরানো হচ্ছে। আমি ভীত হয়ে জেগে উঠলাম এবং চিৎকার করতে লাগলাম। এমতাবস্থায় গাউছে পাক বললেন- বেটা, চুপ থেকো, শুনাটা দেখার মত।

শায়খ আবু হাফস ওমর আর এক জায়গায় বর্ণনা করেন- আমি একবার গাউছে পাকের মজলিসে তাঁর সামনে বসেছিলাম। আমি নূরের প্রদীপের মত এমন একটি জিনিস দেখলাম, যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে জনাব গাউছে পাকের মুখের নিকটবর্তী হয়ে পুনরায় আসমানের দিকে ফিরে গেল। এ রকম তিনবার দেখার পর আমি ভয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং লোকদেরকে বলার মনস্থ করলাম। কিন্তু গাউছে পাক আমাকে বারণ করে বললেন, বেটা, বসে যাও। মজলিসের সম্মান বজায় রেখ। আমি বসে গেলাম এবং তাঁর জীবদ্দশায় কখনো এ ঘটনা কাউকে বলিনি। শায়খ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খিযির মুছেলী বর্ণনা করেন- আমার পিতা বলতেন, সৈয়্যদেনা আবদুল কাদেরের মসলিসে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। তাঁর ব্যক্তিগত বুজুর্গীর কারণে কেউ মসলিসে গলা পরিস্কার বা কোন প্রকার শব্দ করতো না এবং কোন কথাই বলতো না। যখন গাউছে পাক বলতেন- কাল (কথা) হয়ে গেছে এবার হালের দিকে চলো, তখন লোকেরা অস্থির হয়ে পড়তো এবং ওদের মধ্যে হাল ও অজদ এসে যেত। এটা গাউছে পাকেরই কারামত ছিল। তাঁর মজলিসে উপস্থিত কাছে ও দূরের সবাই

একই রকম তাঁর ওয়াজ শুনতেন। তাঁর দৃষ্টি মজলিসে সমবেত লোকদের অন্তরের দিকে হতো এবং কশফের সাহায্যে ওদের অন্তর গুলো আলোকিত করতেন। যখন তিনি মিম্বরে দাঁড়াতেন তখন উপস্থিত শ্রোতারাও দাঁড়িয়ে যেত। যখন তিনি বলতেন চুপ হও, তখন এমন এক নিরবতা বিরাজ করতো যে কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনা যেত না। মজলিসের কোন কোন শ্রোতা যখন নিজের হাত নিচে রাখতে যেত, তখন এমন লোকদের গায়ের সাথে লাগতো, যাদেরকে বাহ্যিক ভাবে দেখা যেত না। কোন কোন দিন তাঁর ওয়াজের সময় আকাশের দিক থেকে কান্নার আওয়াজ শুনা যেত। তিনি ওয়াজ চলাকালীন কোন কোন লোককে বলতেন- আমার কাছে বসিও না। কেননা এটা বেলায়েতের স্থান, এটা পদোন্নতির স্থান। হে তওবা প্রত্যাশীগণ! তোমারা সামনের দিকে এগিয়ে এসো। হে ক্ষমা প্রার্থীরা! আল্লাহর নাম নিয়ে এগিয়ে এসো। হে সরলতাকামীগণ, আল্লাহর নাম নিয়ে এগিয়ে এসো। প্রতি মাসে বা প্রতি বছরে বা জীবনে একবার হলেও আমার মজলিসে উপস্থিত হও এবং অগণিত ধনরাজি নিয়ে যাও। হে সুদীর্ঘ পরিভ্রমন কারীরা! আমার কাছে এসো, কমপক্ষে একটি কথা হলেও শুনে যাও। যখন তোমরা আমার কাছে আসবে, হিংসা-বিদ্বেষ ও ইবাদত-বন্দেগীর অহংকার অন্তর থেকে বের করে দাও এবং যা কিছু আমার কাছে আছে, নিজেদের জন্য গ্রহণ কর। আমার মজলিসে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, ওলী উল্লাহ ও অদৃশ্য জনেরা আগমন করেন এবং আমার কাছ থেকে মহান দরবারের জন্য বিনয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা আজ পর্যন্ত যত নবী বা ওলী সৃষ্টি করেছেন, তারা স্বশরীরে জীবিতাবস্থায় এবং রূহানী ভাবে আমার মজলিসে আগমন করেন।

গাউছে পাকের মজলিসে নবীগণের আগমন

মাশায়েখে কিরাম বর্ণনা করেন যে শায়খ আবু সাঈদ কয়লুভী বলেছেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্য কয়েকজন নবীকে জনাব গাউছুল আযমের মজলিসে কয়েক বার দেখেছি। যে ভাবে প্রভূ স্বীয় প্রিয় গোলামকে ধন্য করে, সে ভাবে নবীগণও গাউছে পাকের মজলিসের উপরে আকাশে চক্কর দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন। আমি দেখেছি যে ফিরিশতাগণ দলের পর দল মজলিসে উপস্থিত হন, জ্বীন ও অদৃশ্য জনেরাও তাঁর মজলিসে আগমন করেন। হযরত খিজির আলাইহিস সালামকেও তাঁর মজলিসে দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছেন যে, সাফল্য ও কামিয়াবীর জন্য এ মজলিসে আসা বড় প্রয়োজন। শায়খ শরীফ আবুল আব্বাস আহমদ বিন শায়খ আবদুল্লাহ হোসাইনী বর্ণনা করেন- একবার আমি শায়খ আবদুল কাদের (রাদি আল্লাহ আনহু) এর মজলিসে হাজির হলাম, তখন তাঁর মজলিসে প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত

ছিল। শায়খ আলী বিন হায়তী গাউছে পাকের মিম্বরের কাছাকাছি বসে ছিলেন এবং ওনার সামান্য তন্দ্রাভাব এসেছিল। গাউছে পাক লোকদেরকে বললেন- নিশ্চুপ হয়ে যাও। যখন সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল, তখন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু শুনা যাচ্ছিল না। তৎপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে শেখ আলী হায়তীর সামনে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে ওনার দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। শায়খ আলী হায়তী চোখ খুললে তিনি ওনাকে জিজ্ঞেস করেন- তুমি কি রসূলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্ন দেখেছ? উনি হ্যাঁ বললে, তিনি বলেন, রসূলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আগমনে আমি তোমার সামনে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে রয়েছি। শায়খ আলী হায়তী বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে নসীহত করেছেন যে আমি যেন আপনার মজলিসে হাজির থাকি। গাউছে পাক বললেন, যা তুমি স্বপ্নে দেখেছ, তা আমি জাগ্রতাবস্থায় দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, সে দিন মজলিসে সাত ব্যক্তি মারা গিয়েছিল।

একদিন হযরত গাউছুল আযম বলেন, আজ আমার বক্তব্য ওসব লোকদের জন্য, যারা কোহকাফের অপর প্রান্ত থেকে এসেছে। ওদের কদম বাতাসে কিন্তু অন্তর পবিত্র সত্বার সান্নিধ্যে রয়েছে। তাঁদের টুপি ও পাগড়ী গুলো খোদার প্রেমানলে জ্বলছে। ঐ সময় তাঁর সাহেবজাদা সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপরোক্ত বক্তব্য শুনে তিনি উপরের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর টুপি ও পাগড়ীতে আগুন লেগে গেল। গাউছে পাক তাড়াতাড়ি মিম্বর থেকে নেমে এসে আগুন নিবালেন এবং বললেন, হে আবদুর রাজ্জাক, তুমিও ওদের অন্তর্ভূক্ত।

লোকেরা শায়খ আবদুর রাজ্জাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কে জিজ্ঞেস করেছিল যে কিসে তাঁকে অজ্ঞান করেছিল। তিনি বলেছিলেন- আমি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র দেখতে পেলাম যে হাজার হাজার লোক মাথানত করে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য শুনছেন। তারা আসমানের দু'প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁদের পোষাক আগুন থেকে অধিক লাল ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চিৎকার করছিল, কেউ কেউ পালিয়ে যাচ্ছিল, আবার কেউ কেউ মজলিসে এসে পতিত হচ্ছিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে কম্পমান অবস্থায় ছিল।

একদিন এক ক্বারী হযরত সৈয়্যদেনা গাউছে পাকের সামনে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ অর্থাৎ আজ রাজত্ব কার? এ আয়াত শুনে গাউছে পাক দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর জালালী অবস্থার কারণে তাঁর সাথে সাথে অন্যরাও

দাঁড়িয়ে গেল। তিনি লোকদেরকে নিজ নিজ জায়গায় বসে যেতে বললেন। অতঃপর তিনি দু'তিনবার বললেন- কে জিজ্ঞেস করছে? আমি বলি, আজ রাজত্ব আমার। এ কথা শুনে আহমদ নামে একব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন- أَنَا أَقُولُ الْمُلْكُ لِي لِأَنَّهُ لِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُهُ অর্থাৎ আমি বলি, রাজত্ব আমার। কেননা তিনি আমার এবং তাঁর মত অন্য কেউ নেই। এ কথা শুনে গাউছে পাক জোরে চিৎকার দিয়ে বললেন, আরে আহমক, কি ভাবে তুমি তাঁর হয়ে গেলে? তুমি কি সেই বিপদ দেখেছ, যা তোমার চতুর্দ্দিকে ঘুরে? এ কথা শুনে সেই ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে স্বীয় শরীরের ছুফিয়ানা পোষাক ছিড়ে ফেলে দিলে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

শায়খ আবু মুহাম্মদ ফরাহ বিন শিহাব শিবানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, যখন হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন বাগদাদবাসীর কাছে নির্ভরযোগ্য একশ বিশিষ্ট আলেম প্রত্যেকে এক একটি মাসআলা নিয়ে গাউছে পাকের খেদমতে হাজির হলেন। যে দিন এ সব ওলামায়ে কিরাম গিয়ে ছিলেন, সে দিন আমিও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ওনারা যে মাত্র মজলিসে গিয়ে পৌছলেন, গাউছে পাক সঙ্গে সঙ্গে মাথানত করে মুরাকিবায় বসলেন, তখন তাঁর বুক থেকে নূরের একটি জ্যোতি আলোকিত হলো, যা অনেকেই দেখেছে, আবার অনেকে দেখে নাই। যে সব ওলামায়ে কিরাম সেই নূরের জ্যোতি দেখেছেন, তাঁরা চিৎকার করে কাপড় ছিড়তে লাগলো এবং শুন্য মস্তকে গাউছে পাকের কদমে গিয়ে পতিত হলেন। মজলিসে হঠাৎ হৈচৈ পড়ে গেল। আমি মনে করলাম ভূমিকম্প হচ্ছে কিনা। হযরত গাউছে পাক এক এক জনকে স্বীয় বুকে লাগাতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করছিলেন- তোমার প্রশ্ন কি এটা? এর উত্তর হলো এই। এ ভাবে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম তাদের উত্তর পেয়ে গেলেন এবং শান্ত হয়ে গেলেন। শায়খ শিবানী আরও বলেন, আমি স্বয়ং সে সব ওলামায়ে কিরামের কাছে গিয়েছিলাম এবং ওনাদের কাছে গাউছে পাকের মজলিসের সে দিনকার ব্যাপারটা জানতে চাইলে, তাঁরা বলেন, যখন আমরা মজলিসে গিয়ে বসলাম, তখন আমাদের জ্ঞানরাজি বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং যখন গাউছে পাক আমাদেরকে তাঁর বুকে লাগালেন, তখন আমাদের সে সব জ্ঞান পুনরায় ফিরে এলো। যেহেতু তিনি আমাদের প্রশ্ন গুলোর জবাব নিজ থেকে দিয়ে দিয়েছিলেন, সেহেতু আমরা কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করিনি। তা ছাড়া তিনি প্রশ্ন গুলোর যে উত্তর দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাও ছিল না।

শায়খ আবুল কাসেম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আলী জাহনী বর্ণনা করেন, আমি একদিন গাউছে পাকের মিম্বরের কাছে বসেছিলাম। মিম্বরের সিড়ির দু'পাশে দুজন

খাদেমও দাঁড়ানো ছিলো। অন্যান্য লোকেরা মিম্বরের আশে পাশে বসেছিল। তাঁর জালালিয়াত ও জজবার কারণে তাঁকে বাঘের মত দেখাচ্ছিল। ওয়াজরত অবস্থায় তাঁর পাগড়ীর একটি অংশ খুলে গিয়েছিল; সে দিকে তাঁর কোন ধ্যান ছিল না। উপস্থিত সবাই তাঁর সম্মানার্থে নিজ নিজ পাগড়ী খুলে মিম্বরের নিচে রেখে দিলেন। ওয়াজ শেষ করার পর তিনি তাঁর পাগড়ী ঠিক করে নিলেন এবং আমাকে বললেন, হে আবুল কাসেম, সবাইকে নিজ নিজ পাগড়ী পরে নিতে বল। সবাই মিম্বরের নিচ থেকে নিজ নিজ পাগড়ী নিয়ে পরে নিলেন, কিন্তু একটি উড়না সেখানে পড়ে রইলো, সেটা কার, কারো জানা ছিল না। গাউছে পাক বললেন– আমাকে দাও। তিনি সেটা তাঁর কাঁধে রেখে মজলিসের বাইরে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, হে আবুল কাসেম! ইস্পাহানে আমার এক বোন আছে, যিনি তোমাদের পাগড়ী খুলে রাখার সময় স্বীয় উড়নাটিও সম্মানার্থে এখানে নিক্ষেপ করেছিল। যখন তোমরা নিজ নিজ পাগড়ী উঠিয়ে নিলে, তখন সে ইস্পাহান থেকে হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ [illegible] থেকে নিয়ে নিল।

গাউছে পাকের কথার প্রভাব

বিচারপতি শেখ আবু সালেহ নছর হতে বর্ণিত, আমার চাচা শায়খ আবদুল্লাহ সৈয়দ আবদুল ওহাব বর্ণনা করেন– আমি অনারবের অনেক শহর ভ্রমন করে অনেক জ্ঞান অর্জন করি। দেশে ফিরে এসে লোকদের সমাবেশে ওয়াজ করার জন্য আব্বাজানের (গাউছে পাক) অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি অনুমতি দিলে, আমি মিম্বরে গিয়ে বসলাম এবং জ্ঞানগর্ব ওয়াজ করতে লাগলাম। আমার আব্বাজান (গাউছে পাক)ও আমার ওয়াজ শুনছিলেন। কিন্তু আমার ওয়াজে কারো অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করলো না এবং কারো চোখে পানি এলো না। সমবেত লোকেরা আমার আব্বাজানকে ওয়াজ করতে অনুরোধ করলেন। অগত্যা মিম্বর থেকে নেমে এলাম। আমার আব্বাজান (গাউছে পাক) মিম্বরে গিয়ে বসলেন এবং ওয়াজ শুরু করার আগে বললেন– "আমি গতকাল রোযা রেখেছিলাম। আমার জন্য ইয়াহিয়ার মা (তাঁর স্ত্রী) ডিম রান্না করেছিল এবং একটি মাটির পাত্রে নিয়ে তা তাকের উপর রেখে ছিল। হঠাৎ কোত্থেকে একটি বিড়াল এসে পাত্রটি ফেলে দিল এবং ভেঙ্গে গেল"– এ কথাটুকু বলতে না বলতেই সমবেত লোকদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। যখন তিনি ওয়াজ শেষ করলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- ব্যাপারটা কি? আপনার একটি মামুলি কথায় লোকদের মধ্যে এ রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে গেল আর আমি এত জ্ঞানগর্ব আলোচনা করেও কোন সাড়া পেলাম না। তিনি বললেন, বেটা! তুমি স্বীয় জ্ঞান ও ভ্রমনের উপর গর্ব করেছিলে। তিনি তার মধ্যমা আসমানের দিকে উঠায়ে বললেন, বেটা! তুমি কি আসমান পর্যন্ত ভ্রমন

করেছ? এরপরও আমি আমার পিতার মিম্বরে বসে ওয়াজ করতাম কিন্তু লোকদের মধ্যে খুবই কম প্রভাব বিস্তার করতো। কিন্তু যখন গাউছে পাক মিম্বরে তশরীফ রেখে বলতেন, নওজোয়ানেরা, ক্ষনিকের জন্য সবরের নামও বীরত্ব, তখন এ কথাটুকুতেই মজলিসের মধ্যে জজবা এসে যেত। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, তুমি নিজের মনের কথা বল কিন্তু আমি অপরের মনের কথা বলি।

ওয়াজের মাঝখানে কেউ কোন মাসআলা জানতে চাইলে তিনি বলতেন, এ মাসআলা বিশ্লেষনকল্পে অনুমতি নেয়ার সুযোগ দিন। অতঃপর তিনি তাঁর মস্তকনত করতেন এবং ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে যেতেন। তিনি এটাকে বড় বোঝা অনুভব করতেন এবং আল্লাহ তাআলা যে রকম ইচ্ছা পোষন করতেন, তিনি সে রকম উত্তর দিতেন। তিনি বলতেন, খোদার কসম, ততক্ষন আমি মুখ খুলতাম না, যতক্ষন আল্লাহ তাআলা আমাকে অনুমতি না দিতেন।

এক দিন তিনি ওয়াজ করার সময় শ্রোতাদেরকে কিছুটা অমনোযোগী ও আলসে প্রকৃতির দেখলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে আমার ওয়াজ শুনার জন্য আসমান থেকে সবুজ পাখী পাঠিয়ে দিতে পারেন। এ কথা বলতে না বলতে মজলিস সবুজ পাখীতে ভরে গেল। সমবেত শ্রোতাগণ নিজ চোখে তা দেখলো।

আর একদিন এ রকম অবস্থায় একটি সবুজ পাখী তাঁর আস্তিনে ঢুকে যায় এবং আর বের হয়নি। অন্য একদিন এক অদ্ভুত আকৃতির পাখী মজলিসের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। লোকেরা ওয়াজের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সেটা দেখতে লাগলে, তিনি বলেন, আমি ইচ্ছে করলে, এ পাখী টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এ কথা বলার দেরী, সেই পাখী টুকরো টুকরো হয়ে ওয়াজের মজলিসে পতিত হলো।

শায়খ বকা বিন বতু (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- আমি একবার শায়খ আবদুল কাদের (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মজলিসে যোগদান করি। তিনি মিম্বরে বসে ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ ওয়াজ বন্ধ করে দিলেন এবং বিভোর হয়ে নিচে নেমে আসলেন। পুনরায় মিম্বরের দ্বিতীয় সিড়িতে গিয়ে বসলেন। আমার চোখের সামনে মিম্বরটি দৃষ্টিসীমা পরিমান প্রসারিত হয়ে গেল এবং মিম্বরের উপর একটি সবুজ গালিচা বিচানো হলো, সেটার উপর সরকারে দু'আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবাসমেত উপবেশনরত দেখা গেল। এরপর দেখলাম জনাব গাউছে পাকের শরীর ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে গেল এবং একটি ক্ষুদ্র পাখীর মত দেখাচ্ছিল। পুনরায় তাঁর শরীর বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং এক ভয়াল আকৃতি ধারন করলেন। কিছুক্ষন পর এ সব দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল।

শায়খ বকার কাছে রসূলে খোদার আগমন ও সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, পবিত্র রূহ সমূহকে আল্লাহ তাআলা শারিরীক আকৃতি ধারণ করার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন। তাঁরা যে আকৃতি ধারণ করতে ইচ্ছুক, সেই আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। জনাব গাউছে পাকের শরীর ছোট বড় হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে- তিনি বলেন, প্রথম জ্যোতি এমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, যার সামনে কোন মানুষ অটল থাকতে পারতো না। যদি জনাব রসূলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁকে আশ্রয় না দিতেন, তিনি পড়ে যেতেন। দ্বিতীয় জ্যোতিটা ছিল জালালী প্রকৃতির, যার কারণে তাঁর শরীরের আকার ছোট হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় জ্যোতিটা ছিল জমালী প্রকৃতির, যার কারণে তাঁর শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিল। এ সব আল্লাহরই কৃপা।

জনাব গাউছুল আযমের নিয়ম ছিল যে সপ্তাহে তিন দিন ওয়াজ করতেন- জুমাবার সকালে, মঙ্গলবার রাতে এবং রবিবার সকালে। তাঁর মজলিসে ইরাকের মাশায়েখ, শীর্ষস্থানীয় মুফতী ও আলেমগণ শরীক হতেন। ওনাদের মধ্যে শায়খ বকা বিন বতু, শায়খ আবু সায়েদ কায়লুবী, শায়খ আলী বিন হায়তী, শায়খ আবু নজীব আবদুল কাদের সহরওর্দী, শায়খ মাজেদ করদী, শায়খ মতর বাদরানী প্রমূখ বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

গাউছে পাকের মজলিসের রূহানী আওয়াজ

রেওয়ায়েত কারী বর্ণনা করেছেন, আমার যতটুকু ধারণা, শায়খ আবদুর রহমান তফসুঞ্জী বাগদাদে কখনো যান নি, কেননা আমি তাঁকে প্রায় সময় তফসুঞ্জে দেখেছি। তিনি অনেক্ষণ যাবত দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি শায়খ সৈয়্যদেনা আবদুল কাদেরের ওয়াজ শুনতে ইচ্ছুক, সে যেন আমার ঘরে চলে আসে। লোকেরা তাঁর ঘরে যেতেন। তিনি তাদেরকে সেখানে বসায়ে গাউছে পাকের ওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনাতেন। অনেকে তারিখ ও সময় লিখে রাখতেন এবং পরে যাচাই করে জানতে পারতেন যে ঠিকই ঐ দিন গাউছে পাক অমুক বিষয়ে ওয়াজ করেছিলেন।

এ ধরণের আর একটি ঘটনা হযরত সৈয়্যদেনা আদী বিন মুসাফির থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি লালশ পাহাড়ে থাকতাম। যে ব্যক্তি জনাব গাউছে পাকের ওয়াজ শুনার ইচ্ছে করতো, সে আমার আস্তানায় চলে আসতো। আমার বন্ধুবান্ধবগণ ওখানে একত্রিত হয়ে জনাব গাউছুল আযমের ওয়াজ শুনতেন।

তাঁর ওয়াজের মজলিসে প্রতিদিন দু'তিনজন মানুষ মারা যেত। প্রায় চারশ ব্যক্তি

তাঁর ওয়াজ লিপিবদ্ধ করতেন। কোন কোন সময় তিনি মজলিসে সমবেত লোকদের মাথার উপর দিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেন এবং পুনরায় মিম্বরে ফিরে আসতেন।

একবার জনাব গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনহু) ওয়াজের মজলিসে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে ইস্রাঈলী, দাঁড়াও, [illegible] মুহাম্মদীর ওয়াজ শুনে যাও। পুনরায় স্বীয় আসনে ফিরে আসলেন। লোকেরা এর রহস্য জানতে চাইলে, তিনি বলেন, জনাব খিজির (আলাইহিস সালাম) আমার মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ওনাকে আমার ওয়াজ শুনার আহবান জানালাম।

মোট কথা এ রকম অনেক ঘটনা তাঁর ওয়াজ মাহফিলে প্রায় সময় ঘটতো। তাঁর এমন কোন ওয়াজের দিন যেত না, যে দিন কোন ইহুদী বা খৃষ্টান মুসলমান হতো না। চোর, ডাকাত, বিপথগামী, ধর্মদ্রোহী ও বদ আকীদার লোকেরা তাঁর মজলিসে এসে তওবা করতো। প্রায় পাঁচ শত ইহুদী খৃষ্টান তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং লক্ষাধিক চোর-ডাকাত তাঁর হাতে তওবা করে সৎপথে ফিরে এসেছিল।

এক রেওয়ায়েতে এটাও বর্ণিত আছে যে এক খৃষ্টান পুরোহিত তাঁর মজলিসে আসলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর সে লোকদেরকে বললো আমি ইয়ামনের অধিবাসী। আমার মনে ইসলাম গ্রহণ করার আগ্রহ সৃষ্টি হলে আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি ঐ ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করবো, যিনি বর্তমান যুগে পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে সবচে উত্তম হবেন। আমি এ চিন্তায় প্রায় সময় মগ্ন থাকতাম। একদিন আমি স্বপ্ন দেখলাম- হযরত ঈসা বিন মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) বলছেন- তুমি বাগদাদে চলে যাও এবং হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা এ যুগে তিনিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মখলুক।

আর একবার তাঁর কাছে তের জন খৃষ্টান এসে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং মজলিসের সবাইকে বললো- আমরা আরবের খৃষ্টান। আমরা যখন ইসলাম গ্রহণ করার মনস্থ করলাম, তখন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে কার হাতে ইসলাম গ্রহণ করা যায়। একদিন এক আহবানকারীর আহবান শুনলাম কিন্তু কাউকে দেখছিলাম না। তিনি আহবান করে বলছিলেন, 'ওহে পথের সন্ধানীগণ, বাগদাদের দিকে যাও এবং শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর হাতে ইসলাম গ্রহণ কর। খোদার কসম করে বলছি, তাঁর সংশ্রবে তোমাদের অন্তর ঈমানী আলোতে ভরে যাবে। এ ঈমানী আলো অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না'।

বায়তুল মুকাদ্দস থেকে এক কদমে বাগদাদ

শায়খ ছদকা বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন– একবার গাউছে পাকের মজলিসে লোকেরা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ও ওয়াজ শুনার অধীর আগ্রহে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর গাউছে পাক তশরীফ আনলেন এবং মিম্বরে গিয়ে বসলেন। তখনও তিনি কোন কথা বলেননি এবং কোন ক্বারীকে কেরাত পড়ার নির্দেশও দেননি। কিন্তু সেই নিরব অবস্থায় লোকদের মধ্যে অজদ এসে গেল। আমি মনে মনে বললাম যে শায়খ তো এখনও কোন কথা বলেন নি এবং কোন ক্বারী কুরআন তেলাওয়াতও করেনি কিন্তু এ অজদ ও উচ্ছাস কি ভাবে সৃষ্টি হয়ে গেল? শায়খ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, আমার এক মুরিদ বায়তুল মুকাদ্দস থেকে এক কদমে বাগদাদে এসেছে। সে আমার হাতে তওবা করেছে। সে আজকের মজলিসের সবাইকে দাওয়াত করেছে। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম– যে ব্যক্তি এক কদমে বায়তুল মুকাদ্দেস থেকে বাগদাদ আসতে পারে, তার কোন্ বিষয়ে তওবার প্রয়োজন? তিনি পুনরায় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে ঐ বিষয়ে তওবা করে যে সেতো কদম উঠিয়ে বায়তুল মুকাদ্দস থেকে বাগদাদ আসলো। এ কদম যেন আল্লাহর মহব্বতের পথে অটল থাকে। এখন আমি ওকে সেই শিক্ষাই দিব।

গাউছে পাকের নিজের ভাষায় তাঁর মরতবা

হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এমন এক খোদার বান্দা; আমার তলোয়ার উন্মুক্ত, আমার কামান লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তাক করা আছে। আমার তীর যথাস্থানে সুরক্ষিত এবং আমার বর্শা সঠিক জায়গায় আঘাত হানে। আমার ঘোড়া সুসজ্জিত। আমি আল্লাহর আগুন। আমি লোকদের আধ্যাত্মিক অবস্থাদি ছিনিয়ে নিই। আমি এমন অথৈ সাগর, যার কোন কূলকিনারা নেই। আমি নিজের সাথে নিজে অস্বাভাবিক কথা বলি। আল্লাহ আমাকে তাঁর বিশেষ নজরে করমে রেখেছেন।

হে রোযাদারগণ, হে রাত-জাগরনকারীগণ, হে পাহাড়বাসীগণ, তোমাদের উপাসনালয় সমূহ ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। আমার হুকুম, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত, কবুল কর। হে বর্তমান যুগের মহিলা, আবদাল ও শিশুগণ, এসো এবং সেই কূল কিনারা বিহীন মহাসাগর দেখে যাও। খোদার কসম, নেককার ও বদকারকে আমার সামনে পেশ করা হয়। খোদার কসম, লৌহে মাহফুজ আমার চোখের সামনে। আমি জ্ঞান সাগরের ডুবুরী, আমার মুশাহেদাই হলো মহব্বতে ইলাহী। আমি লোকদের জন্য আল্লাহর দলীল, আমি নায়েবে রসূল। আমি এ পৃথিবীতে রসূলুল্লাহর উত্তরসূরী। মানুষ, জ্বীন, এমনকি ফিরিশতাদেরও মাশায়েখ আছে কিন্তু আমি ওসব মাশায়েখের শিরমনি।

আমার মরণব্যাধি আর তোমাদের মরণব্যাধির মধ্যে আসমান জমীন পার্থক্য। অন্যদের সাথে আমার তুলনা কর না। হে পূর্ব-পশ্চিমের অধিবাসীগণ, হে আসমান-জমীনের অধিবাসীগণ আমাকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, আমি এমন বিষয় সমূহ জানি, যা তোমাদের মধ্যে কেউ জানে না। আমাকে প্রতি দিন সত্তরবার নির্দেশ দেয়া হয় যে এ কাজ কর, এ রকম কর। হে আবদুল কাদের, তোমাকে আমার কসম, এ জিনিস পান কর; এ জিনিস খাও। আমি তোমার সাথে কথা বলি এবং তোমাকে নিরাপদে রাখি।

জনাব গাউছে পাক আরও বলেন, যখন আমি কোন বিষয়ে কথা বলি, তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় জাতে পাকের কসম করে বলেন, কথাটি পুনরায় বল, কেননা তুমি সত্য বলেছ। আমি ঐ সময় পর্যন্ত কোন কথা বলিনা, যতক্ষণ আমাকে নিশ্চিত করা না হয়। আমার কথায় কোন সন্দেহ সংশয় থাকে না। আমি ওসব বিষয় বন্টন করতে থাকি, যে সব বিষয়ে আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়। যখন আমাকে হুকুম দেয়া হয়, তখন আমি সেটা পালন করি। আমার হুকুম দাতা হলেন আল্লাহ। যদি তোমারা আমাকে অস্বীকার কর, তাহলে এটা তোমাদের জন্য প্রাণনাশক বিষতুল্য হবে। তোমাদের এ নাফরমানী আচরণ তোমাদেরকে মূহুর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেবে। আমি তোমাদের দুনিয়া-আখেরাতকে এক মূহুর্তের মধ্যে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখি। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যদি আমার মুখে শরীয়তের লাগাম না থাকতো, তাহলে আমি তোমাদেরকে ওসব বিষয়েও খবর দিতাম, যা তোমরা খাও, পান কর এবং ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখ। যদি আমার মুখে শরীয়তের লাগাম না থাকতো, তাহলে হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর পাত্রের খবর দিতাম। মোট কথা মনের সব কথা প্রকাশ করে দিতাম। কিন্তু যেহেতু জ্ঞানীর আস্তিনে জ্ঞান আশ্রয় লাভ করে এবং এর গোপন বিষয় সমূহ জ্ঞানী প্রকাশ করে না। তিনি আরও বলেন, আমি তোমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সব বিষয়ে খবর রাখি। আমার দৃষ্টির সামনে তোমরা স্বচ্ছ আয়নার মত।

খোদার সকল বান্দাগণ যখন মকামে কদরে (অদৃষ্ট বন্টনের স্থান) পৌছে, তখন ওদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। কিন্তু আমার জন্য বিনা বাঁধায় অনুমতি রয়েছে বরং অদৃষ্ট জগতে আমার জন্য একটি জানালা খুলে দেয়া হয়েছে, সেটা দিয়ে আমাকে ভিতরে প্রবেশ করানো হয়েছে। আমি তকদির নিয়ে দেন দরবার করেছি এবং আল্লাহর হুকুমে তকদির এদিক-সেদিক করেছি। ঐ ব্যক্তি কামিল, যিনি তকদিরের সামনে মাথানত করে থাকেন না বরং তকদির নিয়ে দেন দরবার করেন। তিনি আরও বলেন, যখন মনকির নকীর কবরে তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে তখন তোমরা ওনাদের কাছে জিজ্ঞেস করিও আমার অবস্থান কোথায়?

গাউছে পাকের মূল্যবান পোষাক

শায়খ আবুল ফজল আহমদ বিন কাসেম বিন আবদান কর্ষী বয্যাজ বাগদাদী বর্ণনা করেন– সৈয়্যদেনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী মাথায় মূল্যবান চাদর এবং বাগদাদের ওলামায়ে কিরামের নিয়মে খুবই মূল্যবান পোষাক পরতেন। এক দিন গাউছে পাকের খাদেম আমার কাছে এসে বললো, গাউছে পাক এমন পোষাক তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার প্রতি গজের মূল্য এক দীনার থেকে কমও নয়, বেশীও নয়। আমি খাদেমকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মূল্যবান পোষাক কার জন্য? সে বললো– আমার মুরশেদ আযমের জন্য। এ উত্তর শুনে আমি মনে মনে বললাম, শায়খ জিলানী যুগের বাদশাহের বৈশিষ্ট্যময় কাপড়ও বাদ দিলেন না। এ কথা চিন্তা করতে না করতে আমার পায়ে একটি পেরেক বিদ্ধ হলো, যার ব্যথায় আমি অস্থির হয়ে গেলাম। অসহ্য যন্ত্রনায় আমার কাতরানীতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল। তারা পেরেকটি বের করার জন্য অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু বের করতে পারলো না। আমি ওদেরকে বললাম, আমাকে হযরত শায়খ আবদুল কাদেরের কাছে নিয়ে চল। তিনি আমাকে দেখা মাত্র বললেন, আবুল ফজল! আমার পোষাক সম্পর্কে তোমার আপত্তি করার কি অধিকার আছে? খোদার কসম, আজ পর্যন্ত আমি এমন কোন কাপড় পরিধান করি নাই, যেটা পড়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দেন নি। আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দেন– হে আবদুল কাদের! এ অধিকারের বিনিময়ে এ কাপড়টি পরিধান কর, যা আমি তোমাকে দান করেছি। হে আবুল ফজল! এ পোষাকটি মূলত: আমার কাফন এবং কাফন সব সময় উন্নত কাপড় দ্বারা তৈরী করা হয়। এ রকম হাজার হাজার কাফন আমি পরিধান করেছি। এ কথাটুকু বলার পর তাঁর পবিত্র হস্ত দ্বারা পেরেকটি বের করে দিলেন এবং বললেন, এ ব্যক্তির ধারনাটাই পেরেকের আকৃতি ধারণ করে ছিল।

গাউছে পাকের কারামাত

গাউছে পাকের অধিকাংশ অলৌকিক ঘটনাবলী ও কারামত সমূহ সঠিক প্রমাণিত। তাঁর অলৌকিক ঘটনাবলী ও কারামত সমূহ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এখানে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি পেশ করা হলো :

হযরত আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ী বলেন, তাঁর কারামত সমূহ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর থেকে যে পরিমাণ কারামাত প্রকাশ পেয়েছে, তা অন্য কারো মধ্যে দৃষ্টি গোচর হয় নি।

লোকেরা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি সর্ব প্রথম কি ভাবে বুঝতে

পারলেন যে তিনি আল্লাহর ওলী? তিনি বলেন, আমার বয়স হয়েছিল তখন দশ বছর। আমি ঘর থেকে বের হয়ে মক্তবের দিকে যাচ্ছিলাম। আমার আশে পাশে দেখতে পেলাম হাজার হাজার ফিরিশতা আমার সাথে চলছে। যখন আমি মক্তবে পৌছলাম, তখন আমি শুনছিলাম যে ফিরিশতাগণ অন্যান্য শিশুদেরকে বলছেন– সরে দাঁড়াও, আল্লাহর ওলী তাশরীফ আনতেছেন। ওনার জন্য বসার জায়গা করে দাও।

আর একদিন আমার পাশ দিয়ে এমন এক লোক গমন করলো, যাকে আমি এর আগে কখনো দেখিনি। ফিরিশতাগণ ওনাকে শুনিয়ে বললেন, এ ছেলে আল্লাহর ওলী। লোকটি ফিরিশতাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলেটি কে? তাঁরা বললেন, 'একে বড় মরতবা দেয়া হবে, যা প্রতিহত করা যাবে না, তাঁকে অসীম ইজ্জত-সম্মান দেয়া হবে, তাঁকে দূরে নয়, কাছে রাখা হবে। তাঁকে প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত রাখা হবে'। চল্লিশ বছর পর আমি জানতে পেরেছিলাম যে লোকটি ছিলেন সেই সময়ের আবদাল।

শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন কায়েদ আদাবী বর্ণনা করেন, আমি শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহ আনহু) এর কাছে বসা ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো– কোন্ জিনিসের উপর আপনার কর্তৃত্ব চলে? তিনি বললেন, সত্যবাদিতার উপর। আজ পর্যন্ত আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। ঐ সময়ও আমি মিথ্যা কথা বলি নি, যখন আমি মক্তবে পড়তাম। তিনি আরও বলেন, আমার শৈশব কালে একদিন আমি আমাদের শহরের পার্শ্ববর্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শোভিত সবুজবৃক্ষে ভরপুর এলাকার দিকে ছুটে গেলাম, এবং একটি চারণ ভূমিতে গবাদি পশুর পালের আশে পাশে খেলতে লাগলাম। এক ষাঁড় আমাকে দেখে বললো, 'হে আবদুল কাদের! আপনিতো এ কাজের জন্য জন্ম হন নি। ষাঁড়ের কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং ঘরে ফিরে এসে ছাদের উপরে গিয়ে বসলাম। তখন আমার চোখের সামনে কাবা শরীফ ভেসে উঠলো, আমি দেখতে পেলাম, কাবা শরীফের অনতিদূরে আরাফাতের ময়দানে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। তৎপর আমি আমার আম্মা জানের কাছে গিয়ে বাগদাদ গমনের অনুমতি চাইলাম। বাগদাদ গিয়ে জ্ঞান আহরনে মনোনিবেশ করলাম এবং সাথে সাথে নেক বান্দাদের সাথে দেখা শুনাও করতে লাগলাম। তিনি আরও বলেন– আমার নিজ শহর জীলানে শৈশব কালে যখন আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের সাথে খেলতে বের হতাম, তখন অদৃশ্য থেকে কোন এক আহবানকারী আমাকে ডাক দিয়ে বলতেন, আমার দিকে এসো, খেলাধুলা ত্যাগ কর। এতে আমি ভয় পেয়ে দৌড়ে মায়ের কোলে গিয়ে বসে পড়তাম। খোদার কসম, এ রকম আওয়াজ এখনও আমি একাকী অবস্থায় শুনতে পাই। যখন আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হলাম, তখন একটি সফরে রওয়ানা হবার সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো– 'হে আবদুল কাদের! তোমাকে আমি আমার জন্য সৃষ্টি করেছি'।

জনাব গাউছে পাক কোন ঘটনা প্রকাশ পাবার ত্রিশ বছর আগেই বলে দিতেন। তাঁর কাছে মলকুল মওতের কর্মসূচীও জানা হয়ে যেত। তাঁর সামনে মাস ও বছর হাজির হতো এবং ঘটমান ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আগাম খবর দিত।

গাউছে পাকের দরবারে মাস ও বছরের উপস্থিতি

গাউছে পাকের সাহেবজাদা শায়খ সায়ফুদ্দীন আবদুল ওহাব বর্ণনা করেছেন, এমন কোন মাস ছিল না, যেটা আমার আব্বাজানের খেদমতে হাজির হয়নি। নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার আগেই প্রতিটি মাস হাজির হতো এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তিতে সে মাসে কোন দুর্ঘটনা হওয়ার থাকলে, কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে বা কোন রহমত বা মঙ্গল হওয়ার থাকলে, তাঁকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয়া হতো।

একবার গাউছে পাকের খেদমতে কয়েক জন মাশায়েখ বসা ছিলেন। তারিখটা ছিল জামাদিউল আখেরের শেষ দিন, ৫৬০ হিজরী। গাউছে পাক আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক সুন্দর চেহারাধারী নওজোয়ান দরবারে প্রবেশ করলো এবং সালাম প্রদান করে বললো- আমি মাহে রজব। আপনাকে মুবারকবাদ দিতে এসেছি। আমার এ মাসে সাধারণ লোকের অনেক উপকার ও সুখ হবে। বর্ণিত আছে, সে বছর সম্পূর্ণ রজব মাস প্রত্যেকের জন্য খুবই সুখের হয়েছিল। সেই রজব মাসের শেষ রবিবারেও তাঁরা তাঁর খেদমতে বসা ছিলেন। তাঁরা দেখলেন বিকৃত চেহারাধারী একলোক দরবারে প্রবেশ করে বললো– আস্‌সালামু আলাইকুম হে ওলীউল্লাহ, আমি শাবান মাস। আমার এ মাসে বাগদাদে বড় ধ্বংসযজ্ঞ হবে, হেজাযে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং খোরাসানে তরবারী যুদ্ধ সংঘটিত হবে। ঠিকই তা হয়েছিল।

একবার গাউছে পাক রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাঁর মজলিসে বসা ছিলাম। সেই মজলিসে শায়খ আলী বিন হায়তী বিন আবু ইউসুফ আবদুল কাদের সরওয়ার্দীও হযরতের কাছে বসা ছিলেন। আরও কয়েক জন মাশায়েখ সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আমরা দেখতে পেলাম যে একজন উজ্জ্বল আকৃতির ও গম্ভীর প্রকৃতির নওজোয়ান এসে বললো– হে আল্লাহর ওলী, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি মাহে রমযান। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য হাজির হয়েছি। এ মাসে আমি আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি। ঠিকই ঐ বছরই পরবর্তী রমযান মাস আসার আগেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন।

শায়খ আবুল কাসেম ওমর বিন মসউদ বজ্জায এবং শায়খ আবু হাফস ওমর কমিমানী বর্ণনা করেন, এক বার শায়খ সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী মজলিসে

সমবেত লোকদের মাথার উপর মেঘমালায় পরিভ্রমনরত ছিলেন। তিনি বললেন, সূর্য যতক্ষন আমাকে সালাম না দেয়, ততক্ষন উদিত হয় না। প্রতিটি নতুন বছর শুরুর আগে আমার কাছে আসে এবং ঘটমান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে। অনুরূপ মাস ও সপ্তাহ আমার কাছে এসে সালাম করে এবং স্বীয় কালে ঘটমান ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে।

তের ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা পূরণ

গাউছে পাকের দরবারে আগত অধিকাংশ মাশায়েখ বর্ণনা করেন, আমরা একদিন গাউছে পাকের মসলিসে বসা ছিলাম। তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার যা চাওয়ার আছে, চেয়ে নাও। শেখ আবুল মসউদ আহমদ বিন হরিমী দাঁড়িয়ে আরয করলেন, আমি আত্ম প্রচেষ্টা ও আত্ম অধিকার বর্জন কামনা করি। শায়খ মুহাম্মদ বিন কায়েদ বললেন, আমি আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তি কামনা করি। শায়খ আবুল কাসেম ওমর বজ্জায বললেন, আমি খোদাভীতি কামনা করি। শায়খ আবু মুহাম্মদ হাসন ফার্সী বললেন, আমাকে আল্লাহর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে দিন। আমি এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। আমি এটা পেতে চাই বরং এর থেকে অধিক কামনা করি। শায়খ জলীল আবু ইউসুফ খতওয়া আরয করলেন, সময়ের সদ্ব্যবহার আমার কাম্য। শায়খ আবু হাফস ওমর গজ্জাল বললেন, আমার অধিক জ্ঞান প্রয়োজন। শায়খ জলীল সরসরী আরয করলেন, আমি কামনা করছি যে ঐ সময় পর্যন্ত আমার মৃত্যু না আসুক, যতক্ষন কুতবিয়তের স্তরে না পৌছি। শায়খ আবুল বরকাত হুমামী বললেন, খোদার প্রেমে আত্মহারা আমার কাম্য। শায়খ আবুল ফতু বললেন, আমাকে কুরআন হাদীছ হেফজ করিয়ে দিন। শায়খ আবুল খায়ের আরয করলেন, আমি এমন মারেফাত কামনা করি, যাদ্বারা হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। শায়খ আবু আবদুল্লাহ বিন হাযরতুল্লাহ বললেন, আমি মুসাফির খানার পাহারাদার হতে ইচ্ছুক। আবুল কাসেম বিন সাহেব আরয করলেন, আমাকে বাবুল আজিজ (মিশরের বাদশা) এর দারোয়ান বানিয়ে দিন।

জনাব গাউছে পাক ওনাদের আকাংখার কথা শুনার পর এ আয়াতটি পড়লেন–

وَكُلًّا نُمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

আমি সবের সাহায্য করি এবং এ সব নেয়ামতসমূহ তোমার পালনকর্তার দান এবং তোমার পালনকর্তার দান থেকে বাঁধা দানকারী কোন কিছু নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম! ওনারা ও সব নেয়ামতসমূহ পেয়েছিলেন, যা ওনারা কামনা করেছিলেন। আমি প্রত্যেককে ঐ স্তরে দেখেছি, যেটার জন্য গাউছে

পাকের কাছে আর্জি পেশ করেছিলেন। অবশ্য জলীল সুরসরী সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে কুতবিয়াত প্রদানের ওয়াদা করা হয়নি। আবার কতেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে শায়খ জলীল সরসরীকে যুগের কুতুব বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে সেটা ছিল তাঁর মৃত্যুর আগে মাত্র সাত দিনের জন্য।

শায়খ আবু মসউদ তাঁর বাসনা অনুসারে আত্ম অধিকার বর্জনে একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলেন এবং তার মর্তবা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি নিজেই বলতেন- আমার মনে জায়নামায ত্যাগের ইচ্ছা কখনো উদিত হয় নি। শায়খ ইবনে কায়েদ মুজাহেদায় পূর্ণ অধিকার লাভ করে ছিলেন। তাঁর যুগে তাঁর মত অন্য কাউকে দেখা যায়নি। তিনি জীবনের শেষ কালে প্রায় চৌদ্দ বছর মাটির নিচে মুজাহেদা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ওনাকে এটা বলতে শুনেছি- আমি ক্ষুধাকে ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণাকে তৃষ্ণার্ত করেছি, নিদ্রাকে নিদ্রিত এবং জাগাকে জাগ্রত করে দিয়েছি। ভয়কে ভীত এবং বিপদ আপদকে পলায়নে বাধ্য করেছি। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই আমার ক্ষমতার উপর ক্ষমতাবান।

শায়খ ওমর বাজ্জায খোদা ভীতির চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিলেন। এমন এক সময় এসেছিল যে তাঁর আপদমস্তক থেকে ভীতির আওয়াজ বের হতো। শায়খ হাসন ফার্সীর প্রতি যখন গাউছে পাক দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি মজলিসে বসাবস্থায় ব্যাকুল হয়ে গেলেন। পর দিন আমি (বর্ণনাকারী) ওনার সাথে দেখা করে মজলিসে তাঁর ব্যাকুলতার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন- আমার রূহানী শক্তি এক যুগ যাবত অধিগ্রহণ অবস্থায় ছিল। জনাব গাউছে পাক আমার সেই রূহানী শক্তি তাঁর এক দৃষ্টিতে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

শায়খ জমীল সময়ের সদ্ব্যবহার ও আত্মিক মনোযোগে এমন বস্তু লাভ করেছিলেন, যা অন্য কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। তিনি পায়খানায়ও তসবীহ লটকিয়ে রাখতেন। কোন কোন সময় এমনও হতো যে তিনি স্বীয় তসবীহ দেয়ালের পেরেকে লটকিয়ে রাখতেন। তখন তসবীহের দানাগুলো এক একটি করে তাঁর হাত পর্যন্ত উড়ে আসতো। বর্ণনাকারী এ রকম ঘটনা নিজ চোখে কয়েক বার দেখেছেন।

শায়খ ওমর গাজ্জাল নানা ধরনের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং এ সব জ্ঞান তাঁর পরিপূর্ণ মুখস্থ ছিল। এক বার তিনি তাঁর পাঠাগারের হাজার হাজার কিতাব বিক্রি করে দেন। এর জন্য যখন তিনি ব্যাপক সমালোচিত হন, তখন তিনি বলেন এখন আমার পাঠাগারে ওসব কিতাবের আদৌ প্রয়োজন নেই। কেননা এ সব কিতাব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

শায়খ আবুল বরকাত হুমামীর প্রতি জনাব গাউছুল আবরার দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি তখন তাঁর মজলিসে বসা ছিলেন। দৃষ্টিপাতের পর তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। এ বেহুঁশী অবস্থায় তাঁকে সেখান থেকে উঠায়ে কূফায় পৌছায়ে দেয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন- আমি একদিন ওনাকে কূফার একটি শরাবখানায় বিভোর অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। আমি ওনার সাথে কথা বলতে চাইলাম কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকালেন না। অগত্যা ফিরে আসলাম। কয়েক বছর পর আমাকে পুনরায় কূফায় যেতে হয়েছিল। তখন আমি ওনাকে একই অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি ওনার কাছে গিয়ে কথা বলতে চাইলাম কিন্তু উনি কোন পাত্তাই দিলেন না। আমি ওনার পাশ থেকে একটু সরে ওনার সামনে বসে গেলাম এবং হাত উঠায়ে বললাম– হে আল্লাহ! আমি গাউছে পাকের ওসীলা দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনি ওনার হুঁশ ফিরায়ে দিন যেন আমি ওনার সাথে কথা বলতে পারি। এটুকু বলতে না বলতে, উনি আমার কাছে এসে সালাম দিলেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে উনি কোন্ অবস্থায় আছেন? তিনি বললেন, ভাই! গাউছে পাকের এক দৃষ্টিতে আমাকে খোদা ভিন্ন অন্য কারো মহব্বত থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এখন আমার কাছে অন্য কোন কিছুর গুরুত্ব নেই। এতটুকু বলে পুনরায় নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন। সেই অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ আবুল ফতুহ ছয় মাসের মধ্যে কুরআন শরীফ হেফজ করে ফেলেন এবং যে কোন কঠিন মাসায়েল তিনি অতি সহজে বুঝে ফেলতেন। তিনি সাত কিরাতে পারদর্শী ছিলেন। হাদীছ শরীফের অনেক কিতাব তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারা তিনি জনগনের উপকার করতেন। এ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ আবুল খায়ের বলেন, যখন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী আমার বুকের উপর হাত রাখলেন, তখন আমি আমার বুকে একটি নূরের আবির্ভাব উপলব্ধি করলাম। সেই দিন থেকে আমার কাছে হক-বাতিলের উপলব্ধি ও হেদায়েত– গোমরাহীর পার্থক্যকরন সহজ হয়ে গেল। অথচ এর আগে এ সব বিষয়ে আমার বড় সংশয় ও সন্দেহ ছিল।

আবদুল্লাহ বিন হায়বতুল্লাহ পর্যটন মন্ত্রনালয়ের দারোয়ান নিয়োজিত হয়েছিল এবং আবুল কাসেম রাজ প্রাসাদের শাহী দরজার দারোয়ান হয়েছিল।

উল্লেখিত ব্যক্তিগণ তাঁদের প্রাপ্ত অবস্থানে দীর্ঘ দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল মালেক জবাল বর্ণনা করেন– আমি হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর মাদ্রাসায় পড়তাম। এক দিন দেখলাম হযরত গাউছে পাক

হাতে একটি বদনা নিয়ে স্বীয় ঘর থেকে বের হলেন। বদনা দেখে আমার মনে এ ভাবটা আসলো যে গাউছে পাক এ বদনা দিয়ে যদি একটি কারামত দেখাতেন। তিনি মুচকি হাসি দিয়ে আমার দিকে তাকালেন এবং সেইবদনাটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। বদনাটি মাটিতে পড়া মাত্রই সেই বদনা থেকে একটি নূর বিকশিত হলো, যদ্বারা আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত সম্পূর্ণ এলাকা আলোকিত হয়ে গেল। তিনি বদনা উঠায়ে নিলে পুনরায় আগের মত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন- জবাল, তোমার এটাই কাম্য ছিল।

এক ব্যবসায়ীর ঘটনা

শায়খ আবুল মসউদ আহমদ বিন আবু বকর হরিমী বাগদাদী নিজ মুখে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন- আবুল মুজাফফর হাসন বিন তমীম নামক এক ব্যবসায়ী শায়খ হাম্মাদ দাবাস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে গিয়ে বললেন- হুজুর, আমি ব্যবসার উদ্দেশ্য সফর করতে চাচ্ছি। শায়খ বললেন- তুমি যদি এ বছর সফর কর, তোমাকে হত্যা করে ফেলবে এবং তোমার মালপত্র সব লুট করে নিয়ে যাবে। আবুল মোজাফফর খুবই মর্মাহত হয়ে মজলিস হতে বের হয়ে আসলেন এবং শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর খেদমতে হাজির হলেন। শায়খ আবদুল কাদের তখন নওজোয়ান ছিলেন। তিনি ওনার সব কথা শুনে বললেন, তুমি সফর কর। সহীহ-সালামতে ফিরে আসবে। আমি এর দায়িত্ব নিলাম। আবুল মোজাফফর গাউছে পাকের কথায় ভরসা পেয়ে সফরে বের হলেন এবং গন্তব্যস্থলে পৌছে তাঁর ব্যবসায়িক সামগ্রী এক হাজার দীনারে বিক্রি করে ফেললেন। অতঃপর তিনি একটি হাম্মাম খানায় গেলেন। সেখানে একটি তাকের উপর দীনারের থলিটা রেখে গোসল করলেন। ফিরে আসার সময় দীনারের থলিটার কথা মোটেই স্মরণ ছিল না। তিনি একটি আবাসিক হোটেলে গিয়ে উঠলেন এবং শুয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি একটি কাফেলার সাথে সফর করছিলেন। পথে আরবী ডাকাতেরা আক্রমন করে কাফেলার প্রত্যেককে হত্যা করে। তিনিও সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই ফেলেন না। তিনি এ ভয়ার্ত স্বপ্ন দেখে জাগ্রত হয়ে কাঁপতে লাগলেন। নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে রক্তের চিহ্ন পেলেন এবং সারা শরীরে মারাত্মক আঘাতের ব্যথা অনুভব করলেন। দীনারের থলির কথাটা মনে পড়লে দৌড়ে হাম্মাম খানায় গেলেন এবং যথাস্থানে থলিটা পেয়ে গেলেন। বাগদাদে ফিরে এসে বুজুর্গদ্বয়ের সাথে দেখা করার মনস্থ করলেন। প্রথমে তিনি শায়খ দাবাসের সাথে দেখা করতে গেলেন। শায়খ দাবাস তাঁকে দেখা মাত্র বললেন, তুমি শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদেরের কাছে যাও। কেননা তিনি আল্লাহর প্রিয় পাত্র। তিনি তোমার বিপদ মুক্তি ও উপকারের জন্য আল্লাহর দরবারে সত্তর বার হাত তুলেছেন। তোমার অদৃষ্টে ক্ষতি ও হত্যা লিখা

ছিল। তাঁর দুআর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তোমার অদৃষ্টের লিখন পরিবর্তন করে দিয়েছেন। স্বপ্নে সেটার দৃশ্য দেখিয়ে হত্যা থেকে এবং ভুলে যাবার ঘটনার মাধ্যমে মালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করলেন।

অতঃপর তিনি শায়খ সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানীর কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে দেখা মাত্র জিজ্ঞেস করলেন- শায়খ দাবাস তোমাকে আমার সত্তর বার সুপারিশের কথা কি বলে দিয়েছেন? আবুল মুজাফফর বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সত্যিই আমি তোমার মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে সত্তর বার প্রার্থনা করেছি। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার অদৃষ্টের লিখন পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং জাগ্রতাবস্থায় ঘটমান বিষয়কে স্বপ্নে রূপান্তরিত করেছেন- يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (আল্লাহ তাআলা যেটা চান মিটিয়ে দেন এবং যেটা চান কায়েম রাখেন) عِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ (তাঁর সামনেই লওহে মাহফুজ)

দার্শনিক জ্ঞান বিলুপ্তিকরন

শায়খ আবুল মুজাফফর মনছুর বিন মুবারক ওয়াসেতী বর্ণনা করেন- আমার যৌবন কালে আমি এক দিন হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মজলিসে হাজির হই। আমার হাতে গ্রীস দর্শন ও আত্মা বিষয়ক একটি বই ছিল। মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি আমাকে বললো, গাউছে পাক এ বই সম্পর্কে তোমাকে কিছু বললে তুমি সেটা ঘরে রেখে আসিও। গাউছে পাক আমাকে যখন বই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমি সেটা ঘরের এক কিনারে রেখে আসার মনস্থ করলাম, যাতে শায়খ অসন্তুষ্ট না হন কিন্তু আমি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিলাম যে বইটি বিনষ্ট করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বইটির অনেক বিষয় আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। তবুও গাউছে পাকের সম্মানার্থে আমি যে মাত্র বইটি রেখে আসতে উঠতে গেলাম, আমি উঠতে পারলাম না। আমার অবস্থা এমন হয়ে গেল যেন আমি হাত-পা আবদ্ধ একজন কয়েদী। তিনি আমাকে বললেন, তোমার বইটি আমাকে দাও। তাঁকে হস্তান্তর করার আগে একটু খুলে দেখি, সব সাদা কাগজ হয়ে গেছে। সমস্ত বর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যাক আমি বইটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি এক এক পৃষ্ঠা উল্টায়ে দেখলেন এবং বললেন- এটাতো মুহাম্মদ বিন জরিস লিখিত 'ফজায়েলে কুরআন'। আমি আশ্চর্য হয়ে বইটি হাতে নিয়ে দেখলাম, ঠিকই বইটি কুরআনের ফজীলতের উপর খুবই সুন্দর ভাবে লিখিত। ইতোপূর্বে আমি দর্শন শাস্ত্রের যে সব বিষয় জ্ঞাত ছিলাম, সব ভুলে গেলাম এবং এমন ভাবে ভুলে গেলাম যে আজ পর্যন্ত একটি বিষয়ও আমার স্মৃতিতে আসেনি।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জীলান নগরের কয়েক জন মাশায়েখ গাউছে পাকের দরবারে এলেন। তাঁরা দেখলেন যে গাউছে পাকের বদনাটা কেবলার বিপরীত মুখী হয়ে পড়ে আছে। তাঁর খাদেম মজলিসে বসা ছিল। তিনি ওর দিকে রোষ দৃষ্টিতে তাকালেন। সাথে সাথে সে মৃত্যু মুখে পতিত হলো। অতঃপর বদনার দিকে তাকালেন। সাথে সাথে বদনাটি কেবলা মুখী হয়ে গেল।

গাউছে পাকের জালালী হালত

বর্ণিত আছে, একবার গাউছে পাকের মাদ্রাসায় বিভিন্ন দেশের অনেক মাশায়েখে কিরাম উপস্থিত হন। গাউছে পাক তাঁর খাদেমকে দস্তরখানা বিছানোর জন্য অর্থাৎ খাবার পরিবেশন করার নির্দেশ দিলেন। খাওয়া যখন শুরু হয়, গাউছে পাক খাদেমকে বললেন, সেও যেন তাঁদের সাথে খেয়ে নেয়। খাদেম বললো, সে রোযাদার। তিনি বললেন, তুমি খেয়ে নাও। তুমি রোযার ছওয়াব পাবে। কিন্তু খাদেম রোযা ভেঙ্গে খেতে রাজি হলো না। তিনি পুনরায় বললেন, তুমি খেয়ে নাও, তুমি এক বছরের রোযার ছওয়াব পাবে। সে পুনরায় বললো- আমি রোযাদার। তিনি আবার বললেন, আমি তোমাকে বলছি খেয়ে নাও। তুমি সারা বিশ্বের রোযাসমূহের ছওয়াব পাবে। সে তবুও খেতে রাজি হলো না। তখন তিনি ওর দিকে জালালী হালতে তাকালেন। এতে সে মাটিতে পড়ে গেল, সমস্ত শরীর ফুলে গেল এবং শরীর থেকে রক্ত ও পুঁজ বের হতে লাগলো। উপস্থিত মাশায়েখে কিরাম খাদেমের জন্য সুপারিশ করতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুললেন না। ওনাদের এ নিরবতার কারণে গাউছে পাকের জালালী হালত প্রশমিত হয়ে যায় এবং সে আগের মত এমন সুস্থ হয়ে গেল যেন ওর শরীরে কোন কিছু হয়নি।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, গাউছে পাকের যুগে কেরামতের অধিকারী এক বুজুর্গ ছিলেন। তিনি বলতেন- আমিতো ইউনুস আলাইহিস সালামের স্তরও অতিক্রম করে গেছি। গাউছে পাকের মজলিসে সেই বুজুর্গের সেই দাবীর কথা আলোচিত হলে, তাঁর চেহারা মুবারক ক্রোধে লাল হয়ে যায়। তিনি বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন কিন্তু রাগের অবস্থায় সেটা নিয়ে তাঁর সামনে রাখলেন। এ দিকে গাউছে পাকে এ অবস্থা হলো , ঐ দিকে সেই দাবীকারী মৃত্যু মুখে পতিত হলো। উনি মারা যাবার পর কোন এক ব্যক্তি ওনাকে স্বপ্ন দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কি রকম আচরণ করলেন? তিনি বললেন- আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত আমার ভ্রান্ত দাবীর ব্যাপারেও মাফ করে দিয়েছেন। এ সব হুযূর গাউছে পাকের করুনা ও

সুপারিশে হয়েছে। আল্লাহ তাআলাও রাজি হয়ে গেছেন এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামও মাফ করে দিয়েছেন।

কতেক মাশায়েখ বর্ণনা করেছেন, এক বার এক চিল গাউছে পাকের মজলিসের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তখন প্রবল ঝড়ো হাওয়া বইতে ছিল এবং চিলটি জোড়ে জোড়ে ডাক দিচ্ছিল। গাউছে পাক দৃষ্টি উপর দিকে উঠায়ে বাতাসকে নির্দেশ দিলেন- এ চিলের মাথা উড়িয়ে দাও। দেখতে না দেখতে চিলটি দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। গাউছে পাক স্বীয় আসন থেকে উঠে নিচে নেমে আসলেন এবং চিলটাকে হাতে নিয়ে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' বললেন। সঙ্গে সঙ্গে চিলটি জীবিত হয়ে আকাশে উড়াল দিল। এ ঘটনাটি উপস্থিত সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন।

ভুনা মোরগের ঘটনা

একবার এক মহিলা তার এক ছেলেকে নিয়ে গাউছে পাকের দরবারে হাজির হলো এবং আরয করলো- 'হুযূর, আমার এ ছেলেটি আপনার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। আমি আমার যাবতীয় দাবী দাওয়া ত্যাগ করে একে আপনার তত্ত্বাবধানে দিয়ে যেতে চাচ্ছি। তিনি ছেলেটি গ্রহণ করলেন এবং ওকে মুজাহেদা, রেয়াজত ও পূর্ব সূরীদের তরীকা মতে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কিছু দিন পর মহিলাটি ছেলেকে দেখতে আসলো। সে এসে দেখলো যে জনাব গাউছে পাক ভুনা মোরগ খাচ্ছেন আর ওর ছেলেটা এক কিনারে বসে যবের রুটি চিবাচ্ছে এবং খুবই দুর্বল ও হালকা পাতলা হয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে মহিলাটি গাউছে পাককে লক্ষ্য করে বললো- হুযূর, আপনিতো মোরগের মাংস খাচ্ছেন কিন্তু আমার ছেলেটা শুকনো যবের রুটি খেয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেল। এ কথা শুনা মাত্র তিনি মোরগের হাড়গুলোর উপর হাত বুলালেন। সাথে সাথে একটি জীবিত মোরগ হয়ে গেল এবং বাক দিতে লাগলো। তৎপর তিনি বললেন, যখন তোমার ছেলে এ ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবে, তখন যা ইচ্ছে, তা খেতে পারবে।

জন্মান্ধ ও মাজুর ছেলের আরোগ্য লাভ

শায়খ আবুল হাসন আলী কবৃশী বর্ণনা করেন- ৫৪৭ হিজরীতে আমি ও শায়খ আলী বিন হায়তী শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানীর দরবারে বসা ছিলাম। তখন আবু গালেব ফজলুল্লাহ বিন ইসমাইল নামে এক ব্যবসায়ী তাঁর নিকট এসে বললো- হুযূর, আপনার নানাজান জনাব রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- 'যদি কেউ দাওয়াত দেয়, তা কবুল করা উচিত'। আমি আপনাকে আমার

গরিবালয়ে খাবার দাওয়াত দিচ্ছি। তিনি বললেন- যদি অনুমতি পাওয়া যায়, তাহলে যাব। অতঃপর দীর্ঘক্ষন মুরাকেবা করার পর বললেন- নিশ্চয় যাব। যথা সময়ে তিনি ঘোড়ার উপর আরোহন করলেন। শায়খ আলী ডান দিকের রিকাব এবং আমি বাম দিকের রিকাব ধরে ব্যবসায়ীর ঘরে পৌছলাম। ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম, বাগদাদের বড় বড় মাশায়েখ, ওলামায়ে কিরাম ও তথাকার গন্যমান্য ব্যক্তিগণও উপস্থিত আছেন। একটি লম্বা দস্তরখানা বিছানো হলো, যার উপর বিভিন্ন খাবার রাখা হলো। ঢাকনা দেয়া একটি বড় পাত্রও দস্তরখানার এক কিনারে রাখা হলো। অতঃপর দাওয়াতকারী আবুল গালেব বললো- 'খাওয়া শুরু করতে পারেন। গাউছে পাক মস্তক অবনত করে না খেয়ে বসে রইলেন এবং অন্যদেরকেও খেতে বললেন না। সবাই একেবারে নিশ্চুপ বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে ও আলী হায়তীকে সেই ঢাক্না দেয়া বড় পাত্রটি ওনার সাম্নে নিয়ে আসার জন্য বললেন। আমরা গিয়ে পাত্রটি নিয়ে আসলাম। যদিওবা পাত্রটি খুবই ভারী ছিল আমরা খুবই কষ্ট করে উঠায়ে শায়খের সামনে আনলাম এবং শায়খের নির্দেশে ঢাক্না খুললাম। ঢাকনা খুলে দেখি, সেখানে এক জন্মান্ধ ও অর্ধাঙ্গগ্রস্থ কুড়ে ছেলে। ছেলেটি ছিল সাহেবে মেজবান আবুল গালেবের। গাউছে পাক ছেলেটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন- 'আল্লাহর হুকুমে উঠ'। ছেলেটি তখনি চোখ খুলে চারিদিকে দেখতে লাগলো এবং ওর শরীরে কোন রোগের লক্ষন পরিলক্ষিত হলো না। এ অবস্থা দৃষ্টে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং চারি দিকে হৈচৈ পড়ে গেল। এ হৈচৈ এর মধ্যে গাউছে পাক ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং কিছু খেলেন না।

আমি শায়খ আবু সাঈদ কায়লবীর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার কথা শুনে বললেন- শায়খ আবদুল কাদের আল্লাহর হুকুমে অন্ধদেরকে দৃষ্টি দান, কুষ্ঠ রোগীদেরকে আরোগ্য দান এবং মৃতদেরকে জীবিত করতে পারেন।

রাফেজী তওবা করলো

কয়েকজন মাশায়েখে কিরাম বর্ণনা করেন- আমরা এক দিন গাউছে পাকের মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় কয়েক জন রাফেজী (শিয়া সম্পদায় ভুক্ত) দুটি মুখবন্ধ বড় টুকরি নিয়ে গাউছে পাকের সামনে আসলো এবং বললো- বলুন দেখি, এ টুকরি দু'টির মধ্যে কি আছে? গাউছে পাক স্বীয় আসন থেকে নেমে এসে একটির উপর হাত রেখে বললেন- এটাতে একটি ছেলে আছে। তিনি তাঁর ছেলে আবদুর রাজ্জাককে টুকরির মুখ খুলতে বললেন। মুখ খোলার পর ঠিকই সেখানে একটি পঙ্গু ছেলে দেখা গেল। তিনি ছেলেটির হাত ধরে বললেন- উঠ। ছেলেটি উঠলো এবং বের হয়ে

আসলো। অতঃপর অপর টুকরির উপর হাত রেখে বললেন, এটাতে একটি সুস্থ ছেলে আছে। টুকরি খোলার পর ঠিকই একটি ছেলে দৃষ্টি গোচর হলো এবং ছেলেটি টুকরি থেকে বের হয়ে আসলো। তিনি ছেলেটির কপালের চুল ধরে বসালেন। এতে ছেলেটি অর্ধাঙ্গ গ্রস্থ হয়ে গেল। আগত রাফেজীরা এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল এবং তওবা করলো। ওদের মধ্যে তিন জন এ দৃশ্য দেখে সেই দিন ভয়ে মারা যায়।

গাউছে পাকের সামনে অদৃশ্য জগতের অধিবাসী

এক দিন গাউছেপাক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় অদৃশ্য জগতের এক ব্যক্তি বাতাসের উপর দিয়ে বাগদাদের সীমানা অতিক্রম করছিলেন। ওনার মাথায় একটি সাদা পাগড়ী এবং দু'কাধে দু'টি ঝান্ডা দেখা যাচ্ছিল। যে মাত্র গাউছে পাকের খানকার কাছাকাছি হলেন, হঠাৎ এমন ভাবে মাঠিতে পতিত হলেন যেমন বাজ পাখী শিকারের উপর পতিত হয়। মাটিতে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ বেহুঁশ হয়ে গাউছে পাকের সামনে বসে রইলেন। অতঃপর গাউছে পাককে সালাম করে আকাশে উড়াল দিয়ে চলে গেলেন। লোকেরা গাউছে পাককে জিজ্ঞেস করলেন- এ কে? তিনি বললেন- এ অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। একান্ত বেপরওয়াভাবে বাগদাদ নগরী অতিক্রম করছিলেন। এ রকম অপর একটি ঘটনা এর আগে উল্লেখিত হয়েছে।

বাগদাদ থেকে নাহাওন্দ গমন ও প্রত্যাবর্তন।

শায়খ আবুল হাসন বাগদাদী বর্ণনা করেন- আমি একবার একটি জরুরী কাজে শায়খ সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানীর সান্নিধ্যে অবস্থান করছিলাম। আমি রাত্রে প্রায় সময় জাগ্রত থাকতাম এবং হুযূরের খেদমত করার সুযোগ পেলে, তা করতাম। এক রাত হুযূর গাউছে পাক ঘর থেকে বের হলেন। আমি তাঁকে অযুর জন্য পানির বদনাটা আগিয়ে দিলাম। তিনি অযু করে তাঁর মাদ্রাসার দিকে গেলেন। মাদ্রাসার দরজাটি নিজ হতে খুলে গেল। আমিও তাঁর পিছু নিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর বাগদাদ নগরীর প্রবেশদ্বারের কাছে পৌছে গেলাম। সেটাও নিজ হতে খুলে গেল এবং আমরা বের হয়ে আসার পর পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল। একটি রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলেন। সামান্য পথ অতিক্রম করার পর একটি শহর দৃষ্টিগোচর হলো, যা আমি আগে কখনো দেখিনি। তিনি এমন একটি ঘরে গিয়ে উঠলেন, যেটা একটি মুসাফির খানার মত মনে হচ্ছিল। ওখানে ছয় ব্যক্তি বসা ছিলেন। তাঁরা তাঁকে সালাম করলেন। আমি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক দিক থেকে কান্নার আওয়াজ পেলাম। কিছুক্ষন পর সেটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। যে দিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল, সেদিকে এক ব্যক্তি এগিয়ে গেলেন এবং কাঁধে করে এক জনকে নিয়ে আসলেন। খালি মস্তক, লম্বা চুল ও গোঁফ বিশিষ্ট একব্যক্তি ওখানে বসা ছিল। লোকেরা ওকে গাউছে পাকের সামনে নিয়ে

আসলো। গাউছে পাক ওকে কলেমা পড়ায়ে মুসলমান করলেন। অতঃপর ওর লম্বাচুল ও গোঁফ কেটে দেয়া হলো এবং একটি উন্নত পোষাক পরিধান করায়ে ওর নাম মুহাম্মদ রাখা হলো। এরপর তিনি ওসব লোকদেরকে বললেন– এ ব্যক্তিকে সেই মৃত ব্যক্তির জায়গায় আবদাল নিযুক্ত করা হলো। ওনারা সবাই সমস্বরে বললেন– আমরা ওনাকে গ্রহণ করে নিলাম। অতঃপর শায়খ ওখান থেকে বের হয়ে আসলেন। আমিও তাঁর পশ্চাৎগামী হলাম। সামান্য পথ অতিক্রম করতে না করতে বাগদাদ নগরীর দ্বার প্রান্তে উপনিত হয়ে গেলাম। নগরীর শাহী দরজা খুলে গেল। মাদ্রাসার সামনে আসতেই মাদ্রাসার দরজাও খুলে গেল। আমরা যথারীতি ঘরে পৌছে গেলাম। সকালে শায়খের কাছে বসলাম এবং অন্যান্য দিনের মত কিছু পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বের হচ্ছিল না কেননা তখনও আমার মাথায় বিগত রাতের ঘটনাটি কিলবিল করছিল। তিনি আমাকে বললেন– বেটা, এটা পড় যেন তোমার মনে কোন চিন্তা ভাবনা না থাকে। আমি আরয করলাম– হুযূর, আমি রাত্রির ঘটনাটা মোটেই ভুলতে পারছি না। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? এবং ঐ লোকগুলো কারা? তিনি বললেন– সেই শহরের নাম নাহাওয়ান্দ। যে ছয়জনকে তুমি দেখেছ, তাঁরা হলেন এ যুগের আবদাল। যে ব্যক্তির ক্রন্দন শুনে ছিলে ও মারা গিয়েছিল, তিনিও ছিলেন একজন আবদাল। যে ব্যক্তি ওকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছিল। তিনি হলেন হযরত খিজির আলাইহিস সালাম। যাকে আমি কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করেছিলাম, সে ছিল কস্তুনতুনিয়া নিবাসী একজন খৃষ্টান। আমার উপর হুকুম হয়েছিল যে ওকে যেন যুগের আবদাল নিয়োগ করা হয়। তাই ওকে আনা হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়ে আবদালগনের অন্তর্ভূক্ত করা হলো।

হযরত গাউছে পাক আমার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিলেন যে তাঁর জিন্দেগীতে আমি যেন এ ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ না করি।

জ্বীনদের থেকে অপহৃত মেয়ে উদ্ধার

শায়খ আরেফ আবুল খায়ের বশির বিন মাহফুজ বর্ণনা করেন– আমি বাগদাদে থাকতাম। ফাতেমা নামে আমার এক মেয়ে ঘরের ছাদে উঠার পর সেখান থেকে গায়েব হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওকে না পেয়ে গাউছে পাকের খেদমতে গিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন– 'তুমি করখ অঞ্চলের জন মানব শুন্য এলাকায় চলে যাও। ওখানে একটি টিলার উপর বসে তোমার চারি দিকে একটি রেখা টেনে দিও এবং আমার ধ্যান করিও। অতঃপর বিছমিল্লাহ পাঠ করিও। রাতের অন্ধকারে তোমার আশে পাশে জ্বীনদের বিভিন্ন বাহিনী নানা আকৃতিতে আনা গোনা করবে। ওদেরকে দেখে তুমি ভয় পেও না। সেহেরীর সময় তোমার সামনে জ্বীনদের বাদশাহ হাজির হবে এবং তোমার হাজত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তুমি ওকে বলিও– 'আমাকে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী বাগদাদ শহর থেকে পাঠিয়েছেন। তুমি আমার মেয়েকে খুঁজে বের করে দাও'।

নির্দেশ মতে আমি সেই জনশুন্য এলাকায় গেলাম। হযরত শায়খ যা যা করতে বলেছেন, তা সব করলাম। রাতের অন্ধকারে কুন্ডলীর বাইরে ভয়ার্ত আকৃতির জ্বীনদের বিভিন্ন বাহিনীর আনাগোনা লক্ষ্য করলাম। ভয়ার্ত আকৃতির কারণে তাদের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। সেহেরীর সময় ঘোড়ায় আরোহন করে জ্বীনদের বাদশাহ আসলো। তার আশে পাশে অনেক জ্বীন ছিল। সে কুন্ডলীর বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো– আমাকে কি কাজের জন্য ডাকা হলো? আমি বললাম– আমাকে হযরত গাউছে পাক পাঠিয়েছেন। সে গাউছে পাকের নাম শুনা মাত্র ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো এবং তার সাথে আগত অন্যান্য জ্বীনেরা কুন্ডলীর বাইরে বসে গেল। অতঃপর আমি আমার মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালাম। ঘটনা শুনার পর জ্বীনের বাদশাহ সমস্ত জ্বীনদেরকে লক্ষ্য করে বললো– তোমরা কেউ জান, সেই মেয়েটাকে কে নিয়ে এসেছে? জ্বীনেরা এক জ্বীনকে ধরে বাদশাহের সামনে হাজির করলো। বাদশাহ ওকে জিজ্ঞেস করলো– তুমি মেয়েটিকে কেন নিয়ে গেছ? সে বললো– মেয়েটি গাউছে পাকের শহরে থাকতো। আমি ওকে দেখে ওর প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বাদশাহ ওর শিরোচ্ছেদ করার নির্দেশ দিল এবং আমার মেয়েকে ফেরত দিল।

আমি জ্বীনের বাদশাহকে বললাম– শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর আদেশ আপনি যে ভাবে পালন করেছেন, এ রকম আর কাউকে দেখিনি। সে বললো– খোদার কসম, যখন আবদুল কাদের জিলানী আমাদের প্রতিদৃষ্টি পাত করেন, তখন পৃথিবীর সমস্ত জ্বীন কাঁপতে থাকে। যখন আল্লাহ তাআলা যুগের কোন কুতুব মোতায়েন করেন, তখন সমস্ত জ্বীন ও মানুষকে ওনার আদেশের অধীনস্থ করে দেন।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর খেদমতে ইস্পাহান থেকে একজন লোক এসে আরয করলো– হুযূর, আমার স্ত্রী ভীষণ মাথা ব্যথায় ভুগছে, কোন চিকিৎসায় কাজ হয়নি। ওকে নিয়ে বড় মসীবতে আছি। তিনি বললেন, এটা এক জ্বীনের আসর, যার নাম খানেস। সে চরনদ্বীপে থাকে। তুমি বাড়ীতে ফিরে গিয়ে স্ত্রীর কানে এ কথাটি বল– 'খানেস! তোমাকে বাগদাদ থেকে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী বলেছেন যে তুমি যেন এখানে আর না আস, অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই ইস্পাহানী লোকটি জানালো, আমি হযরতের বর্ণনা অনুসারে আমল করার পর আজ পর্যন্ত আমার স্ত্রীর মাথা ব্যথা করেনি।

শায়খ বযায (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, আমি এক শুক্রবার জনাব সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানীর সাথে জামে মসজিদের দিকে রওয়ানা হই। আমি লক্ষ্য করলাম যে পথে তাঁকে কেউ সালাম করলো না। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, ব্যাপারটা কি? অন্যান্য শুক্রবারে তিনি আসার পথে লোকেরা তাঁকে সালাম করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তো। কিন্তু আজ কেউ তাঁর দিকে তাকাচ্ছে না। এতটুকু চিন্তা করতে, না করতে শায়খ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং এর পরপরই দেখি

লোকেরা তাঁর সাথে মুসাফাহা করতে লাগলো। এমন কি লোকের চাপে আমি শায়খের কাছাকাছি থাকতে পারছিলাম না। তখন আমি মনে মনে বললাম- পূর্বের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। শায়খ আমার দিকে তাকায়ে বললেন- হে ওমর! তুমিইতো এটা চেয়েছিলে। তুমিতো জান না যে লোকদের অন্তর আমার হাতের মুষ্টিতে। যখন ইচ্ছে করি, আমার দিকে আকৃষ্ট করি আবার যখন ইচ্ছে করি আমার থেকে বিমুখ করে রাখি।

বাগদাদে অগ্নিপাত

শায়খ বকা বিন বতু (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এক যুবককে হযরত সৈয়্যদেনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর দরবারে নিয়ে এসে বললো- 'হুযূর এ যুবকের জন্য একটু দুআ করুন। খোদার কসম, এ আমার ছেলে।' আসলে লোকটি মিথ্যা বলেছিল এবং উভয়ে অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল। হুযূর গাউছে পাক খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, অবস্থা কি এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে মানুষ আমার সামনেও মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করছে না। এ রাগান্বিত অবস্থায় তিনি মজলিস থেকে উঠে ঘরে চলে গেলেন। এ দিকে সেই অসৎ প্রকৃতির লোকদ্বয়ের ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো এবং আশে পাশে এ আগুন প্রসারিত হতে লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যে শহরের অধিকাংশ জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়লো। আমার মনে হলো, বাগদাদে খোদার গজব নাযিল হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের মত আগুন বর্ষিত হচ্ছিল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় গাউছে পাকের ঘরে প্রবেশ করলাম। তখনও তিনি রাগান্বিত ছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম এবং একান্ত সাহস করে বললাম- হুযূর! আল্লাহর মখলুকের প্রতি রহম করুন। অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমার প্রার্থনায় তাঁর রাগ প্রসমিত হয় এবং আগুন নিভে যায়।

শায়খ আবু বকরের আধ্যাত্মিক শক্তি রহিতকরণ

শায়খ আবু সাউদ হরিমী, শায়খ আলী বিন ইদ্রিস ইয়াকুবী, শায়খ শাহাব উদ্দীন আবু হাফস ওমর বিন মুহাম্মদ সহরওর্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) বর্ণনা করেন, শায়খ ওব্বাদ ও শায়খ আবু বকর বিন হাম্মামী কাশফের অধিকারী ছিলেন। শায়খ আবদুল কাদের শায়খ আবু বকরকে বলতেন- 'হে আবু বকর! তোমার সম্পর্কে পবিত্র শরীয়তের অভিযোগ রয়েছে'। এরপরও তিনি কয়েকটি শরীয়তের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকতেন না।

এক দিন হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রোসাফা জামে মসজিদে শায়খ আবু বকরের দেখা পেলেন। তিনি ওনার বুকের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন- আবু বকরের যাবতীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান রহিত করা হোক। এর পর দিন থেকে শায়খ আবু বকর সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন এবং বাগদাদের বাইরে চলে গেলেন। যখনই বাগদাদ আসার মনস্থ করতেন, উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে

যেতেন। অন্য কেউ উঠাতে চেষ্টা করলে, সেও উপুড় হয়ে পড়ে যেত। কিছু দিন পর শায়খ আবু বকরের মাতা গাউছে পাকের খেদমতে হাজির হলেন এবং কান্না জড়িত কণ্ঠে স্বীয় সন্তানের সাক্ষাত লাভের বাসনা ব্যক্ত করলেন। আরও বললেন- যখনই আমি ওর কাছে যাবার মনস্থ করি, তখনই আমি মাটিতে পড়ে যাই। হযরত কয়েক মূহর্ত মুরাকাবা করার পর বললেন- তুমি যাও। আমি ওকে বাগদাদ আসার অনুমতি দিচ্ছি। সে তোমার ঘরের কুয়া থেকে তোমার সাথে কথা বলবে। মাশায়েখে কিরাম বর্ণনা করেছেন যে এরপর থেকে সপ্তাহে একবার শায়খ আবু বকর মাটির ভিতর দিয়ে বাগদাদ প্রবেশ করতেন এবং ঘরের পাশের কুয়া থেকে মায়ের সাথে কথা বলতেন। পরবর্তীতে শায়খ আদি বিন মুসাফিরকে গাউছে পাকের কাছে সুপারিশকারী হিসেবে পাঠালে, তিনি ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

মিয়া মুজাফফর জামাল এবং শায়খ আবু বকর পরস্পর বন্ধু ছিলেন। তাঁরা একবার আল্লাহ তাআলার বারগাহে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের কোন বাসনা আছে কিনা জানতে চাইলে, মিয়া মুজাফফর জামাল আরয করেন- আমার ভাই শায়খ আবু বকরের রহিতকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ফিরিয়ে দেয়া হোক। আল্লাহ তাআলা বললেন- রহিতকরণতো আমার বিশিষ্ট ওলী শায়খ আবদুল কাদেরের আবেদনে হয়েছে। তুমি ওনার কাছে যাও এবং আমার তরফ থেকে ওনাকে বল যেন শায়খ আবু বকরকে মাফ করে দেয় এবং আপন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। আমিও ওকে মাফ করে দিয়েছি। সে সময় সরকারে দু'আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তশরীফ আনেন এবং বলেন- মুজাফফর! আমার নায়েবকে গিয়ে বল যেন আবু বকরের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ফিরিয়ে দেয়। কারণ এটা ওনার ব্যক্তিগত আক্রোশে করেননি বরং আমার শরীয়তের প্রতি অবহেলার কারণে করা হয়েছে। আমি ওকে মাফ করে দিয়েছি।

এ ঘটনার পর হযরত মজাফফর জামাল বড় আনন্দিত হয়ে শায়খ আবু বকরের কাছে গেলেন এবং ওনাকে এ সুসংবাদ জানালেন। তিনি যাওয়ার আগেই সমস্ত ঘটনা কাশফের মাধ্যমে ওনার জানা হয়ে গিয়েছিল। উভয়ে এক সঙ্গে হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহ আনহু) এর খেদমতে হাজির হলেন এবং হযরত মুজাফফর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তবে তিনি একটি বিষয় ভুলে গিয়েছিলেন, যা গাউছে পাক স্মরণ করায়ে দিলেন এবং বললেন- মুজাফফর! তুমি বন্ধুত্বের হক যথাযথ ভাবে আদায় করেছ। গাউছে পাক শায়খ আবু বকরকে তওবা করতে বললেন এবং বিশেষ করে সে সব বিষয় থেকে বিরত থাকতে বললেন, যে গুলোর কারণে ওনার এ অবস্থা হয়েছিল। অতঃপর তিনি ওনাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এর ফলে ওনার রহিতকৃত সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ফিরে পান।

শায়খ মুজাফফর বলেন, আমি শায়খ আবু বকরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে উনি ঐ সময় মাটির নিচে দিয়ে কিভাবে ওনার মায়ের সাথে দেখা করতে আসতেন। তিনি বলেছেন, যখন আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলার ইচ্ছাপোষন করলাম, তখন কোন

একটা কিছু আমাকে মাটির নিচে টেনে নিয়ে যেত এবং আমার ঘরের কাছে পৌছে যেতাম। এ ভাবে পুনরায় মাটির নিচ দিয়ে ফিরিয়ে আনা হতো।

শায়খ এবাদের দাবী

শায়খ এবাদ নামক এক বুজর্গ দাবী করলেন যে জনাব গাউছুল আযমের ইন্তেকালের পর তিনি জীবিত থাকবেন এবং তাঁর বেলায়েতের উত্তরাধিকারী হবেন। গাউছে পাক এ কথা শুনে শায়খ এবাদের হাত ধরে বললেন- 'হে এবাদ, স্মরণ রেখ, তোমাকে তোমার কাপড়ের আস্তিনে নিক্ষেপ করছি। আমি আমার ধ্যানের ঘোড়াগুলোকে তোমার গুনাবলীর ময়দানে হাকাচ্ছি'- এ বলে তাঁর হাত শায়খ এবাদের হাত থেকে আলাদা করে নিলেন এবং শায়খ এবাদের বেলায়েত ছিনিয়ে নিলেন। ফলে ওনার সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল। তিনি একযুগ এ অবস্থায় রইলেন। সেই যুগে শায়খ জমীল বদভী নামে এক বুজুর্গ গাউছে পাকের একান্ত সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন। তাঁর ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে ওনার শরীর টুকরা টুকরা হয়ে গেল এবং ওনার শরীর থেকে এক উজ্জ্বল আলো বের হলো। তিনি সব কিছু শুনছিলেন, দেখ ছিলেন এবং বুঝতে ছিলেন। এরপর তার শরীরকে ফিরিশতা জগতের এমন এক জায়গায় উঠায়ে নেয়া হলো, যেখানে মাশায়েখে কিরামের একটি জামাত উপস্থিত ছিলেন। ওসব মাশায়েখে কিরামের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি তাঁকে চিনতেন। এ সময় তাঁদের সামনে দিয়ে সুগন্ধময় হালকা বাতাস প্রবাহিত হলো। এতে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং বললেন- এ বাতাস গাউছে পাকের ঘর থেকে এসেছে মনে হচ্ছে। তাঁর গুনাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা, তাঁর জ্ঞানসমূহের বর্ণনা দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কোন এক ব্যক্তি সেই মজলিসে প্রার্থনা করলেন- হে আমার পরওয়ারদেগার, আমি তোমার বারগাহে আমার ভাই এবাদের জন্য আবেদনকারী হয়ে এসেছি। তখন তাঁকে জানানো হলো যে যিনি তার বেলায়েত ছিনিয়ে নিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তার বেলায়েত ফিরিয়ে দিতে পারে না।

শায়খ জমীল যখন মানবীয় অবস্থায় ফিরে এলেন এবং গাউছে পাকের খেদমতে হাজির হলেন, তখন গাউছে পাক ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন- জমীল! তুমি কি এবাদের ব্যাপারে আবেদন করেছিলে? আরয করলেন, জ্বী, হ্যা, আবেদন করেছিলাম। তিনি বললেন, ওকে আমার সামনে নিয়ে এসো। যখন এবাদকে ওনার সামনে আনা হলো, তিনি বললেন- এবাদ! হজ্বযাত্রীদের সাথে খালি পায়ে হজ্বে চলে যাও।' তাঁর এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি হজ্ব গমনিচ্ছু এক ইরাকী কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফরদ ময়দান অতিক্রম করার সময় এক বৃক্ষ দেখে তাঁর অজদ (আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস) এসে গেল এবং একটি চিৎকার দিয়ে সেমা করতে লাগলেন। সেমা করতে করতে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং শরীরের প্রতিটি লোম কুপ দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। এমন কি তাঁর উভয় পা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিছুক্ষন পর ওনার অবস্থা আস্তে আস্তে উন্নতি হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসলো।

সেই সময় জনাব গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) শায়খ জমীল বদভীকে খবর দিলেন, আল্লাহ তাআলা এ সময় ফরদ নগরীতে এবাদের মর্তবা ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর নামে শপথ করেছিলাম যে এবাদের বেলায়েত ততক্ষন ফিরায়ে দেয়া হবে না, যতক্ষন সে বিরহের রক্ত সাগরে ডুব না দেয়। আজ সে রক্ত সাগরে ডুব দিয়েছে এবং ওর আগের অবস্থা ফিরে পেয়েছে।

কতেক মাশায়েখ বর্ণনা করেছেন যে, যখন এবাদসহ কাফেলা ফরদ এলাকায় পৌছে, তখন আরবী ডাকাতেরা কাফেলার উপর আক্রমন করে। এবাদের অভ্যাস ছিল কোন কাজ শুরু করার আগে চিৎকার দিতেন। তিনি ডাকাতদের প্রতি পাল্টা আক্রমন করার জন্য একটি চিৎকার দিলেন কিন্তু সেই চিৎকারে তিনি মারা যান। কাফেলার লোকেরা তাঁকে সেখানেই দাফন করেন। হযরত গাউছে পাক সে দিনই জমীল বদভীকে এবাদের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করেছিলেন। গাউছে পাক প্রায় সময় বলতেন আবু বকর ও এবাদ উভয়ে আমার আধ্যাত্মিক অবস্থার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করেছিল। তাই আল্লাহ তাআলা উভয়ের গরদান মেরে দিয়েছেন।

শায়খ কবীর আবুল হাসন বিন আলী হায়তী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার জনাব গাউছে পাকের আস্তানার দিকে গেলেন। তিনি গাউছে পাকের দরজার সামনে পা উপর দিকে লঠকানো অবস্থায় এক যুবককে দেখলেন। যুবকটি আলী হায়তীকে অনুরোধ করলো, তিনি যেন গাউছে পাকের কাছে ওর জন্য সুপারিশ করেন। আলী হায়তী জনাব গাউছে পাকের খেদমতে ওর জন্য সুপারিশ করলে, তিনি বলেন- আমি তোমার সুপারিশের কারণে ওকে মাফ করে দিলাম। শায়খ আলী হায়তী যখন সেই যুবককে ক্ষমার কথা শুনালেন, তখন সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে উড়াল দিল। লোকেরা শায়খ আলী হায়তীকে জিজ্ঞেস করলো- যুবকটা কে ছিল? তিনি বললেন- সে ছিল বেলায়েতের অধিকারী এক নওজোয়ান। সে বাগদাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সে মনে করে ছিল যে, এ শহরে কোন কামিল ব্যক্তি নেই। জনাব গাউছে পাক ওর ধারনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন এবং ওর বেলায়েত শক্তি রহিত করে পা উপর দিকে করে লটকায়ে রাখেন। যদি শায়খ আলী হায়তী সুপারিশ না করতেন, তাহলে সারা জীবন এ অবস্থায় থেকে যেত।

শায়খ হামাদ দবাসের হাত ও আলমে বরযখ

অনেক মাশায়েখে কিরাম থেকে এ ঘটনাটি বর্ণিত আছে যে একবার সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এক দল ফকীহ ও দরবেশসহ বৃহস্পতিবারে শায়খ হামাদ দবাসের মাজারে যান। মারাত্মক গরম সত্বেও তিনি অনেক্ষন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর অন্যান্য সাথীরাও দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর উৎফুল্ল মনে ফিরে আসলেন। লোকেরা তাঁর কাছে এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলেন- আমার যৌবন কালের কথা, যখন আমি জুমাবার বাগদাদের বাইরে রেসাফা মসজিদে নামায পড়তে যেতাম তখন শায়খ দবাস ও তাঁর মুরিদানেরাও আমার সাথে

যেতেন। একবার নদীর পাড় দিয়ে যাবার সময় শায়খ দবাস আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করেন। তখন অত্যন্ত শীতের দিন ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যাক, জুমার গোসলটা হয়ে গেল। আমার গায়ের যুব্বাটা ছিল মোটা কাপড়ের, ফলে পানিতে ভিজে খুবই ভারী হয়ে গিয়েছিল। আমাকে এ অবস্থায় একাকী ফেলে শায়খ হামাদ ও তাঁর সাথীরা চলে গেলেন। আমি খুবই কষ্ট করে কূলে উঠে ওনাদের পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। এ ঘটনার আমি খুবই কষ্ট পেলাম এবং যথেষ্ট ঠান্ডা লেগেছিল। শায়খ হামাদের সাথীরা আমাকে নিয়ে রসিকতা করতে লাগলো। শায়খ হামাদ ওদেরকে বাধা দিয়ে বললেন– আমি ওনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য এটা করিনি, কেবল পরীক্ষা করার জন্য এ রকম করেছি।

আজ আমি হযরত হামাদকে কবরে এমন অবস্থায় দেখলাম যে তিনি একটি অতি মূল্যবান পোষাক পরিধান করে আছেন। তাঁর মাথায় মুকুট, হাতদ্বয়ে চান্দির দস্তানা এবং পায়ে সোনার জুতা শোভা পাচ্ছে। কিন্তু এত শান শওকত সত্বেও তাঁর একটি হাত অবশ দেখলাম। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম- এটার কি হয়েছে? তিনি বললেন, এটা সেই হাত, যে হাত দিয়ে আপনাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম। আপনি কি এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না? আল্লাহর কাছে কি সুপারিশ করতে পারেন না? আমি কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং ক্ষমা করার পর আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করলাম যেন তিনি হযরত হামাদের হাত সুস্থ করে দেন। আমি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে পাঁচ হাজার আওলীয়ায়ে কিরাম নিজ নিজ কবর থেকে হযরত হামাদের জন্য সুপারিশ কল্পে আল্লাহ তাআলার বারগাহে হাত উঠায়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত হামাদের হাত সুস্থ করে দেন এবং উৎফুল্ল মনে সেই হাত দিয়ে আমার সাথে মুসাফাহা করেন। এ ঘটনা যখন বাগদাদে প্রকাশ পেল, তখন সে সব সুফী ও শায়খগণ, যারা হযরত হামাদের মুরিদ ছিল, তারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে এ ঘটনাটার সত্যতা যাচাই করা দরকার। তাঁদের সাথে বাগদাদের একদল ফকীহও একত্রিত হয়ে গাউছে পাকের মাদ্রাসার দিকে আসলেন। কিন্তু কেউ গাউছে পাকের কাছে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না। অবশেষে তাঁরা দু'জন মাশায়েখকে এ কাজের জন্য নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে মতে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন আয়ুব হামদানী ও হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন শুয়াইব কুর্দীকে এ কাজের দায়িত্ব দিলেন। এ দু'বুজুর্গ কশফ ও কারামাতের অধিকারী ছিলেন। তাঁদেরকে জুমাবার পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করে বাস্তব ঘটনার সম্যক জ্ঞান লাভ করে অন্যান্যদের জানানোর জন্য বলা হলো। তারা মুরাকাবায় বসলেন। হঠাৎ হযরত শায়খ ইউছুফ খালি পায়ে গাউছে পাকের মাদ্রাসার দরজার দিকে দৌড়ে আসলেন এবং জোর গলায় বলতে লাগলেন– আল্লাহ তাআলা এ মাত্র হযরত হামাদ দবাস কে আমার সামনে উপস্থিত করেছেন এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমি যেন গাউছে পাকের মাদ্রাসায় গিয়ে ঘোষনা করি– যা কিছু তাঁরা শুনেছেন, সবই একেবারে সত্য। তাঁর এ কথা বলা শেষ হতে না হতে হযরত শায়খ আবদুর রহমানও দৌড়ে এসে সেই কথাই বললেন, যা একটু আগে হযরত আবু ইউছুফ ঘোষনা করলেন। এ কথা শুনার পর সমস্ত মাশায়েখ গাউছে

পাকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খিজির বিন হোসাইন মুসলী বর্ণনা করেন– আমার আব্বাজান প্রায় সময় হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানীর খেদমতে থাকতেন। তিনি তের বছর যাবত হযরত জিলানীর কারামাত গভীর ভাবে অবলোকন করতে থাকেন। কারামতসমূহের মধ্যে এমন কারামতও লক্ষ্য করেছেন যে, যে সব রোগী যাবতীয় চিকিৎসা থেকে বিফল হয়ে গাউছে পাকের কাছে ধর্না দিত, তিনি তাদের জন্য দুআ করতেন এবং স্বীয় হাত মুবারক ওদের শরীরের উপর বুলিয়ে দিতেন। এতে রোগী আরোগ্য লাভ করতো।

খলীফা মুস্তনজদের এক আত্মীয় উদরী রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, যার ফলে ওর পেট ফুলে গিয়েছিল। ওকে গাউছে পাকের খেদমতে আনা হলে, তিনি ওর পেটের উপর হাত বুলায়ে দিলেন। এতে রোগীর পেট স্বাভাবিক ও সুস্থ হয়ে যায়।

জনাব আবুল মায়ালী আহমদ বিন জাফর বিন ইউনুস বাগদাদী হোসাইনী বর্ণনা করেন– আমার পনের মাস বয়স্ক ছেলের মারাত্মক জ্বর হয়েছিল, কোন চিকিৎসায় আরোগ্য হচ্ছিল না। আমি খুবই হতাশ ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী আমাকে ডেকে বললেন– গিয়ে শিশুর কানে বল- "হে উম্মে মলদম! (অবিরাম জ্বরের নাম) তোমাকে শায়খ আবদুল কাদের নির্দেশ দিচ্ছে যে এ শিশুকে ত্যাগ করে হিলার দিকে চলে যাও"। আমি এ রকম করার পর আমার শিশুর জ্বর কমে গেল কিন্তু হিলা অঞ্চলে কঠিন জ্বরের প্রাদুর্ভাব হলো।

জনাব গাউছে পাকের দুআয় শায়খ আরিফ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবুল ফাতাহের ৮৩ বছর পর্যন্ত কফ-কাশি হয়নি। শায়খ আরিফ বর্ণনা করেন– আমার শৈশব অবস্থায় আমার খুব কফ-কাশি ছিল। একদিন আমি গাউছে পাকের কাছে বসা ছিলাম। তাঁর সম্মানার্থে আমার কাশিটা দমন করে রেখেছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন– হে মুহাম্মদ, ভয় করো না। আজকের পর থেকে তোমার কফ-কাশি হবে না। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার কফ-কাশি হয়নি। আমার বর্তমান বয়স তিরাশি বছর।

গাউছে পাকের এক খাদেম ছিলেন, যাকে তিনি তবিল (লম্বু) বলে ডাকতেন। এক দিন সে গাউছে পাকের কাছে আরয করলেন– হুযুর, আপনি আমাকে লম্বু বলে কেন ডাকেন, আমি তো বেটে। তিনি বললেন—তুমি দীর্ঘ হায়াত পাবে এবং দীর্ঘ পথ সফর করবে। ঠিকই এ ব্যক্তি ১৩৭ বছর জীবিত ছিল এবং সে নানা দেশ-বিদেশ ভ্রমন করেছিল এবং বিশ্বের অনেক আশ্চর্যকর জিনিষ দেখেছিল। সে কাফ পাহাড় পর্যন্ত গেয়েছিল এবং সেই সর্বপ্রথম কাফ পাহাড়গামী।

একবার দজলা নদীতে জলোচ্ছাসের কারণে বাগদাদ নগরী প্লাবিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। লোকেরা গাউছে পাকের কাছে এসে সাহায্য চাইলেন। তিনি স্বীয় লাঠিটা নিয়ে নদীর কিনারে গেলেন এবং পানির উপর জোরে একটি আঘাত করলেন এবং

বললেন– 'এ পর্যন্ত'। এতে পানি ওখানেই থেমে গেল, আর এগুতে পারলো না।

বর্ণিত আছে, বাগদাদে দু'টি খেজুর গাছ দীর্ঘ দিন শুষ্ক অবস্থায় ছিল। চার বছর যাবত কোন খেজুর ধরেনি। গাউছে পাক সেই দু'টির একটির নীচে অজু করলেন এবং অপরটির নীচে নামায পড়লেন। এর পর পরই বৃক্ষ দু'টি সবুজ ও তরতাজা হয়ে গেল এবং খেজুর ধরতে লাগলো। এ ধরনের তাঁর অগনিত কারামত বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। এ সব কারামত ও ঘটনাবলী বর্ণনা করে বা লিখে শেষ করা যাবে না।

গাউছে পাকের উন্নত আখলাক

শায়খ মুয়াম্মর আবু মুজাফফর মনছুর বিন মুবারক বিন ফজল ওয়াসেতী বর্ণনা করেন– আজ পর্যন্ত আমি গাউছে পাকের মত উন্নত চরিত্র ও উদার মনা কোন ব্যক্তি দেখিনি। তিনি বড় দয়ালু ও হৃদয়বান ছিলেন। তিনি বড় বুজুর্গ ও বড় মর্তবার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করতেন। সালাম দিতে তিনি সব সময় অগ্রগামী থাকতেন। ফকীর-মিসকীনদের সাথে নরম ব্যবহার করতেন। তাঁর দুয়ারে আগত ফকীরদেরকে কিছু না কিছু দান করতেন। তিনি কখনো কোন আমীর বা ধনীর কাছে যেতেন না, কোন বাদশাহ বা উজীরের দরবারে গমন করতেন না। এক দিন আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বসে বসে কি যেন লিখতে ছিলেন। সে সময় তাঁর শরীরে ছাদ থেকে সামান্য মাটি পড়লো। তিনি ঝেড়ে ফেললেন। এ ভাবে তিনবার পড়লো এবং তিনি তিনবার ঝেড়ে ফেললেন। চতুর্থবার যখন পড়লো, তখন তিনি মাথা উঠায়ে ছাদের দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে একটি ইঁদুরের বাচ্চা এ দুষ্টামী করতেছে। সেটার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে দু'টুকরা হয়ে নীচে পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে তিনি লিখা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলেন। আমি আরয করলাম– হুযূর! এতে কাঁদার হেতু কি? তিনি বললেন– আমার মনে এ ধারনা আসলো যে কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে আমার সামান্য ক্ষতি করা হলে, ওর পরিনতি যেন সেই ইঁদুরের মত না হয়।

শায়খ আবুল কাসেম ওমর বিন মসউদ ও শায়খ বযায বর্ণনা করেন– এক দিন সরকার গাউছে পাক মহি উদ্দীন জিলানী স্বীয় মাদ্রাসায় অযু করার সময় একটি পাখী তাঁর উপর মল ত্যাগ করে। তিনি মস্তক উত্তোলন করে উপরের দিকে তাকালে, পাখিটি দু'টুকরা হয়ে নিচে পড়ে যায়। অযু থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি কাপড়ের সেই অংশ ধুয়ে ফেললেন, যেখানে বিষ্টা লেগেছিল। এর পর কাপড়টি খুলে আমাকে দিয়ে বলেন– এটা বিক্রি করে দাও এবং বিক্রি করে যা পাও, তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দাও।

শায়খ আবু ওমর ওয়া উসমান ছরিফনী ও শায়খ আবু মুহাম্মদ আবুদল হক হরিমী (রহমতুল্লাহে আলাইহিমা) বর্ণনা করেন– একদিন আমাদের পীর মুরশেদ জনাব সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী কেঁদে কেঁদে বলছিলেন– হে পরওয়ারদেগার! আমি

আমার রূহকে তোমার জন্য কি ভাবে হাদিয়া দিব। কেননা এটা প্রমানিত যে সমস্ত জগত ও এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব তোমারই। অতঃপর এ শেরটি আবৃত্তি করলেন–

وَمَا يَنْفَعُ الْاَعْرَابِ اِنْ لَمْ يَكُنْ تَقى

وَمَا ضَرَّذَا تَقْوى لِسَانِ يَعْجَمِ

অর্থাৎ আরবী হলে কোন লাভ নেই, যদি পরহেজগারী না থাকে আর পরহেজগারীকে ক্ষতি করে না যদি ভাষা আজমী (অনারবী) হয়।

হাফেজ আবু আবদুল্লাহ বুখারী বর্ণনা করেন– আমাকে আবু আবদুল্লাহ জবায়ী একটি চিঠি লিখেছিলেন, যার মধ্যে এ কথাটি উল্লেখিত ছিল যে হযরত শায়খ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী বলতেন– 'আমার মনের বাসনা হচ্ছে প্রথম জীবন কালের মত জঙ্গলে ও জনমানবহীন এলাকায় চলে যাই, যেন আমাকে আল্লাহর কোন বান্দা না দেখে এবং আমিও যেন কাউকে না দেখি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর বান্দাদের উপকার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার হাতে পাঁচশ ইহুদী-খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এক লাখের অধিক ফাসিক, ফাজির, চোর, ডাকাত আমার হাতে তওবা করেছে। সাধারণ জনগণকে সংশোধন করা এটা একটি বড় কাজ।

গাউছে পাকের সাহেবজাদা শায়খ আবদুর রজ্জাক বর্ণনা করেন, আমার আব্বাজান শায়খ আবদুর কাদের জিলানী তাঁর বেলায়েতের আহকাম জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত হজ্ব করেননি। একবার হজ্বে যাবার সময় আমি তাঁর উটের লাগাম ধরে যাচ্ছিলাম। হিলা নামক স্থানে পৌছে আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। এ জায়গাটি বাগদাদের সীমানার মধ্যে ছিল। তিনি আমাকে বললেন, এ বস্তিতে গিয়ে এমন লোক খুঁজে বের কর, যে সবচে গরীব ও অসহায়। আমি বস্তিতে গিয়ে এমন একটি ঘর খুজে পেলাম, যার দরজা-জানালা ও দেয়াল ভেঙ্গে গেছে এবং ঘরের আঙ্গিনায় তাবু খাটায়ে এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা বসবাস করছেন। এ খবর জানালে আমার আব্বাজান ওদের কাছে গিয়ে সেখানে অবস্থান করার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর আমার আব্বাজান তাঁর সকল সফর সঙ্গীসহ সেই ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় নিলেন। এলাকায় এটা জানাজানি হয়ে গেলে ধনী ও গন্যমান্য ব্যক্তিরা এসে তাঁকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করলেন কিন্তু তিনি কোথাও যেতে রাজি হলেন না। এলাকার লোকেরা উট, ছাগল ও নানা তোহফা সেই গরীবালয়ে নিয়ে আসলো এবং জিনিস পত্রের বিরাট স্তুপ পড়ে গেল। দূর দরাজ থেকেও অনেক লোক তাঁকে দেখতে আসলেন এবং অনেক জিনিসপত্র নিয়ে আসলো। তিনি সব কিছু সেই বাড়ীওয়ালাকে দান করে ভোররাতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। শায়খ আবদুর রজ্জাক বলেন– এক বছর পর আমি সেই এলাকা দিয়ে যাবার সময় দেখলাম যে সেই ঘর জিনিস পত্র ও গবাদী পশুতে ভরপুর ছিল।

এটা গাউছে পাকের নিয়ম ছিল যে তাঁর জায়নামাযের নিচে সে সব মনিমুক্তা অদৃশ্য থেকে আসতো, তাতে তিনি হাত লাগাতেন না বরং খাদেমকে বলে দিতেন যে

ওর প্রয়োজন মত জায়নামাযের নিচ থেকে নিয়ে রুটিওয়ালা সবজীওয়ালা ও অন্যান্য দোকানদারদের প্রাপ্য যেন পরিশোধ করে দেয়। তখনকার খলীফার পক্ষ থেকে কোন উপঢৌকন পাঠালে তিনি বলতেন, আবুল ফাতাহ চাক্কি ওয়ালাকে দিয়ে দাও। তিনি মেহমান, দরবেশ ও মুসাফিরদের জন্য আবুল ফাতাহ থেকে বাকীতে আটা আনাতেন। যখনই তখনকার খলীফা কোন তোহ্‌ফা পাঠাতেন, তিনি তা চাক্কিওয়ালাকে দিয়ে ওর প্রাপ্য পরিশোধ করতেন।

গাউছে পাকের বিশেষ খাদেম শায়খ আবদুল লতিফ বিন শায়খ আবু নাজাত বর্ণনা করেন– এক বার গাউছে পাক কয়েক জন লোকের কাছে ঋণি হয়েছিলেন। সে সময় একদিন এক অপরিচিত লোক এসে কোন অনুমতি না নিয়ে গাউছে পাকের পাশে বসে গেল এবং দীর্ঘক্ষন আলাপ আলোচনা করলো। অতপর এক টুকরা সোনা বের করে গাউছে পাকের হাতে দিয়ে বললো– এটা আপনার জন্য, এ কথাটুকু বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত শায়খ আমাকে বললেন– এ স্বর্ণ নিয়ে যাও এবং ঋণদাতাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তিনি আমাকে বললেন– এ লোকটি ছিল ছারাফে কদর। ছারাফে কদর কাকে বলে জানতে চাইলে তিনি বলেন– আল্লাহর সেই ফিরিস্তা, যিনি ওসব ওলীগনের সাহায্য করেন, যারা ঋণ গ্রস্ত হন। আল্লাহ তাআলা ওনার সাহায্যে কর্জ থেকে মুক্ত করেন।

গাউছে পাকের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এক কৃষক তাঁর জন্য খুবই যত্নসহকারে গম উৎপাদন করতেন। অন্য এক বন্ধু যিনি রুটি তৈরীর কাজ করতেন, তাঁর জন্য খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে পাঁচটি রুটি তৈরী করতেন এবং দিনের বেলা তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন। তিনি রুটিগুলো মজলিসে বিতরণ করতেন এবং যা অবশিষ্ট থাকতো তা নিজের জন্য রাখতেন। এ ভাবে যা কিছু আসলো, তিনি মজলিসে সমবেত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তিনি কোন তোহফা অগ্রাহ্য করতেন না। যে কোন তোহফা বা নজরানা গ্রহণ করতেন এবং সেখান থেকে নিজেও খেতেন।

শরীফ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ খিযির হোসাইনী মুছেলী বর্ণনা করেন– আমাকে আমার আব্বাজান বলেছেন– এক জুমাবার আমি হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানীর সাথে জামে মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যবসায়ী তাঁর কাছে এসে বললেন– আমার কাছে যাকাত ছাড়া এমন কিছু মাল আছে, যেগুলো আমি হকদারদের মধ্যে বিতরণ করতে চাচ্ছি কিন্তু কোন হকদার খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, হকদার হোক বা না হোক, যাকে পাও তাকে দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন প্রতিদান দেবেন, যেটার তুমি হকদার হও, বা না হও।

একবার হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) এক মর্মাহত ফকীরকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন– তোমার কি হয়েছে? সে বললো– হুযুর, আজ আমি দজলা নদীর পাড়ে গিয়ে মাঝিকে বলেছিলাম আমাকে ওপাড়ে পৌঁছায়ে দিতে। কিন্তু সে আমাকে পাড় করালো না। এতে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। ফকীরের এ কথাটুকু বলা শেষ হবার আগেই এক ব্যক্তি এক হাজার দীনারের থলি নিয়ে

হাজির হলো এবং গাউছে পাককে হাদিয়া হিসেবে দিলেন। তিনি সেই মনমরা ফকীরকে বললেন, এ থলিটি নিয়ে মাঝির কাছে যাও এবং ওকে দিয়ে বল আগামীতে যেন কোন ফকীরকে পাড় করাতে অস্বীকার না করে। তিনি তাঁর গায়ের জামাটাও খুলে ফকীরকে দিয়ে বললেন– এটা বাজারে বিশ দিনারে বিক্রি করে জীবন যাপন কর।

শায়খ আবুল কাসেম ওমর বযায বর্ণনা করেন– এমন এক সময় ছিল, যখন আমিও সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানীর মজলিসে বসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সেই সময়টা ছিল আমার জন্য মধুর স্বপ্নময়, নীরবতাপূর্ণ ও অপূর্ব আরামদায়ক। তাঁর তিরোধানের পর অন্য কোন মজলিসে সেই শান্তি পাইনি। তিনি বড় নির্মল পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বড় উদার ও দরাজ হস্ত ছিলেন। তাঁর দস্তরখানা খুবই লম্বা ছিল। তিনি মজলিসে আগত মেহমানদের সঙ্গে আহার করতেন। ছাত্রদেরকে আর্থিক সাহায্য করতেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে প্রত্যেকে মনে করতেন যে তিনিই ওনার সবচে প্রিয়ভাজন। তিনি বন্ধু-বান্ধবদের যথাযত কদর করতেন, ওনাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করতেন। অন্যদের শপথকে গ্রহণ করতেন। নিজের জ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করতেন না। আমি তাঁর থেকে অধিকতর লজ্জাবোধ সম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি।

শায়খ ওমর বযায বলেন– সৈয়্যদেনা আবুদল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রায় সময় এ শের (কবিতা) টি খুবই উৎফুল্ল মনে পড়তেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اِنِّىْ فِىْ جِسْوَارِ فَتًى

حَامِى الْحَقِيْقَةِ نَنَّاع وَضَرَار

لَايَرْفَعُ الطَّرْفَ اِلَّاعِنْدَ مَكْرَمَةٍ

مِنَ الْحَيَاءِ وَلَايَغْضِى عَلٰى عَارٍ

অর্থাৎ খোদা তাআলার শোকর যে আমি এমন এক যুবকের আশ্রয়ে আছি, যিনি হাকীকতের অধিকারী এবং লাভ-ক্ষতি যে কোন কিছু করতে পারেন। যিনি বুজুর্গী প্রকাশের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় লজ্জায় চক্ষু উপরের দিকে উঠান না এবং লজ্জার খাতিরে কাউকে নির্দেশও দেন না।

শায়খ আবুল হাসন আলী কর্শী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে লোকেরা গাউছে পাকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন– গাউছে পাক ছিলেন একটি নূর, প্রস্ফুটিত চেহারাধারী, লাজুক, উদারমনা, বন্ধুবৎসল ও সহানুভূতিশীল মানব। আমি কখনো তাঁর থেকে অধিকতর স্পষ্ট ভাষী ও সত্যবাদী কাউকে দেখিনি।

আবুল হাসন আলী বিন আদম মুহাম্মদী তাঁর শায়খ মুহিউদ্দীন আবি আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হামেদ বাগদাদীর ৬৩৬ হিজরীর লিখনি থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন– সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) অত্যন্ত খোদাভীরু ও

কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয়ে সদা অশ্রু প্রবাহিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জালালী প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রার্থনা গ্রহণকারী ও একান্ত দয়াপরায়ন। তিনি বাজে লোকদের থেকে সদা দূরে থাকতেন। তবে সত্য প্রিয় লোকদেরকে খুবই কদর করতেন। যখন কারো কোন অপরাধ প্রকাশ পেত, তিনি মাফ করে দিতেন। কোন ভিক্ষুককে তিনি খালি হাতে ফিরাতেন না। তাঁর কাছে দুটি জামা থাকলে, একটি দান করে দিতেন। আল্লাহর তৌফিক তাঁর জন্য উৎসর্গিত ছিল। পৃষ্ঠপোষকতা সব সময় তাঁর জন্য বরাদ্ধ ছিল। তাঁর জ্ঞান ছিল সভ্যতা দানকারী, সান্নিধ্য ছিল আদব শিক্ষা দানকারী এবং বক্তৃতা ছিল উপদেশদানকারী। সত্যতাই ছিল তাঁর খাদ্য, বিজয় ছিল পুঁজি, ভদ্রতা ছিল তাঁর স্বভাব, আল্লাহর জিকির ছিল তাঁর নিত্য দিনের কাজ। চিন্তা ভাবনা ছিল তাঁর পোষাক, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ছিল তার চালিকা শক্তি, সত্য দর্শন ছিল তাঁর সান্তনা, শরীয়তের সম্মান ছিল বাহ্যিক ভূষন এবং হাকীকতের গুনাবলী ছিল তাঁর বাতেনী শক্তি।

গাউছে পাকের মুরিদানের মর্যাদা

শায়খ ছালেহ আবুল হাসন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বাগদাদী প্রকাশ ইবনে হামামী বর্ণনা করেন– আমি যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্ন দেখলাম, তখন আরয করলাম– ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার একান্ত বাসনা যেন কুরআন-সুন্নাহর উপর অটল থাকা অবস্থায় আমার পরিসমাপ্তি হয়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন– আল্লাহ ও রসূলের আহকাম ও সুন্নাতের উপর তুমি মারা যাবে এবং তোমার পথ প্রদর্শক হবে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী। আমি তাঁর কাছে এ প্রার্থনা তিনবার করেছি। তিনি প্রত্যকবার একই জবাব দিলেন।

মাশায়েখে কিরামের একটি বৃহত্তম জমাত বর্ণনা করেন– সৈয়্যদেনা গাউছুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর মুরিদগনের জিম্মাদার হবেন। তাঁর কোন মুরিদ ততক্ষন ইন্তেকাল করবে না, যতক্ষন ওর তওবা কবুল হবে না।

শায়খ আছিল আবু মুহাম্মদ আবদুল লতিফ বিন শায়খ আবুন নজীর আবদুল কাহের বিন আবদুল্লাহ সহরওয়ার্দী আল ফকীহ আস সূফী বর্ণনা করেন– আমার আব্বাজান বলেছেন– শায়খ হামাদ দবাস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) থেকে প্রতি রাত্রে মধু মক্ষিকার শব্দের মত এক প্রকার গুঞ্জন শুনা যেত। হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই সময় ওনার কাছে আনাগোনা করতেন। লোকেরা ওনার কাছে আরয করলেন, তিনি যেন শায়খ হামাদ থেকে সেই শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি সে সম্পর্কে হযরত হামাদ দবাসের কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন– আমার বার হাজার মুরিদ আছে। আমি খুবই দ্রুততার সাথে তাদের নাম ধরে ডাকি এবং তাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করি যেন আমি আল্লাহর কাছ থেকে

মনজুর করায়ে নিতে পারি। আমার কোন মুরিদ ততক্ষন মৃত্যুবরন করে না, যতক্ষন ওর তওবা কবুল হয় না বা এক মাসের মধ্যে ওর গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় না। এ ভাবে আল্লাহর রহমত ওসব মুরিদদের প্রতি হয়ে থাকে, যারা শায়খ হামাদের হাতে বায়াত করে। এ কথা শুনে হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী শায়খ হামাদকে বলেন– যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে এ মুরতবা দান করেন, তাহলে আমি আল্লাহ তাআলা থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেব যেন কিয়ামত পর্যন্ত আমার কোন মুরিদ ততক্ষন ইন্তেকাল করবে না, যতক্ষন ওর তওবা কবুল করা হবে না। আমি এ প্রতিশ্রুতির জিম্মাদার হবো।

শায়খ আবুল কাসেম ওমর বযায বর্ণনা করেন– হযরত সৈয়্যদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে শ্রদ্ধারসাথে স্মরণ করে, কিন্তু আপনার মুরিদ হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি বা আপনার থেকে খেলাফতের খেরকা (জামা) পায়নি, সে কি আপনার সহানুভূতি লাভকারী লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে? তিনি বলেন– যে ব্যক্তি কেবল নামের সাথে সম্পর্ক রাখবে বা অন্তরে আমার প্রতি ভাল ধারনা পোষন করবে, আল্লাহ তাআলা ওর তওবা কবুল করবেন যদিওবা সে আমার থেকে অনেক দূরে হয়ে থাকে। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে তিনি আমার বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত, আমার নাম জপকারী ও আমার প্রতি ভাল ধারনা পোষনকারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি আরও বলেছেন– যদি আমার নাম স্মরণকারী কারো দোষত্রুটি বা গুনাহ পশ্চিমপ্রান্তে প্রকাশ পায় এবং আমি পূর্ব প্রান্তে থাকি, তখনও আমি ওর হেফাজতের জিম্মাদার হবো এবং দোষ ত্রুটি গোপন করবো। আমাকে এক চোখের পথ এক দীর্ঘ আমল নামা দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে আমার মুরিদগনের নাম লিখা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভক্তদের নাম উল্লেখিত আছে। আমাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে ওসব লোকদেরকে আমার খাতিরে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আমি মালেককে (দোযখের দারোগা) জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার কাছে আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউ আছে কি? সে বললো– না। আল্লাহর কসম, আমার হাত আমার মুরিদগনের উপর ঐ রকম প্রসারিত, যে ভাবে জমীনের উপর আসমানের ছায়া। আল্লাহর জালালিয়াত ও ইজ্জতের কসম, আমি ততক্ষন জান্নাতে পদার্পন করবো না, যতক্ষন আমি আমার সমস্ত মুরিদগণকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে না পারবো।

এক মুরিদের আশ্চর্যজনক ঘটনা

এ ঘটনাটি অনেক কিতাবে বর্ণিত আছে যে হযরত সৈয়্যদেনা গাউছুল আযম (রাদি

আল্লাহ আনহু) এর এক মুরিদের একই রাত্রে সত্তরবার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। প্রতিটি স্বপ্নদোষ হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন মহিলার সাথে। কতেক মহিলা ছিল ওর পরিচিত আবার কতেক ছিল অপরিচিত। ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি গোসল করে গাউছে পাকের খেদমতে হাজির হলো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই গাউছে পাক ওকে দেখা মাত্র বললেন- রাতের ঘটনাকে এত মারাত্মক মনে কর না। আমি রাত্রে লওহে মাহফুজের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলাম। তখন দেখলাম যে তোমার অদৃষ্টলিপিতে অমুক অমুক মহিলার সাথে যেনা করাটা নির্ধারিত ছিল। (গাউছে পাক ওকে সেই সময় প্রায় মহিলার নাম ও আকৃতি বলে দিয়েছিলেন) আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম যেন তোমার সেই অদৃষ্টলিপি পরিবর্তন করে দেয় এবং তোমাকে সে পাপাচার থেকে মাহফুজ রাখে। তাই ওসব ঘটনাকে স্বপ্নদোষের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। শায়খ আবু সালেহ মুহাম্মদ দাউদ বিন আলী বিন আহমদ বাগদাদী বর্ণনা করেন- আমি স্বপ্ন দেখলাম যে শায়খ মারুফ করখী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে অনেক লোকের ফরিয়াদ পেশ করা হচ্ছে। তিনি সে সব ফরিয়াদ আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করছেন। আমাকে দেখা মাত্র শায়খ মারুফ বললেন- দাউদ, তুমিও তোমার আর্জির কথা বল যেন আমি আল্লাহর কাছে পেশ করতে পারি। আমি আরয করলাম, আমাকে জনাব গাউছুল আযম মুহিউদ্দীন জিলানী বরখাস্ত করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, কিছুতেই না, তুমি বরখাস্ত হওনি, তোমাকে বরখাস্ত করা হবে না। আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সেহেরীর সময় গাউছে পাকের মাদ্রাসার দরজার সামনে গিয়ে বসে গেলাম এবং চিন্তা করতে লাগলাম, কিভাবে খবর দিই। ইত্যবসরে হযরত গাউছে পাক ভিতর থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বললেন- তোমাকে বরখাস্ত করা হয়নি, বরখাস্ত করা হবে না। তুমি তোমার প্রার্থনা জানাও, যাতে আল্লাহর কাছে পেশ করতে পারি। আল্লাহর কসম, আজ পর্যন্ত আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের যে কারো ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে পেশ করেছি, তিনি তা কবুল করেছেন।

গাউছে পাকের সাহেবজাদা ইমাম হাফেজ তাজউদ্দীন আবু বকর আবদুর রজ্জাক বর্ণনা করেন- আব্বাজান এক রাত্রে আমার আম্মাজানকে ঘুম থেকে উঠায়ে বললেন- অল্প করে ভাত পাক কর। তিনি উঠে ভাত পাক করলেন এবং একটি প্লেটে নিয়ে আব্বাজানের সামনে আনলেন। তখন প্রায় অর্ধরাত। ঘরের দেয়ালটি হঠাৎ ফেটে গেল এবং সেটার ফাঁক দিয়ে একজন লোক ঘরে প্রবেশ করে সেই ভাত খেতে লাগলো। ভাত খেয়ে সেই লোক যখন চলে যাচ্ছিল, আব্বাজান আমাকে বলরেন- ওনার কাছে কিছু চাও ও নিজের জন্য দুআ করাও। আমি তাড়াতাড়ি দেয়ালের কাছে গিয়ে ওনার কাছে দুআ চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন- এ সব কিছু আমি আপনার আব্বাজানের দুআ ও খেরকা (জামা) এর বরকতে অর্জন করেছি। ভোরে যখন আমি এ ঘটনা শায়খ আলী হায়তীর কাছে বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন- আজ পর্যন্ত এ রকম কাউকে কে

দেখিনি যিনি আপনার আব্বাজানের নজরে করম ও খেরকা (জামা) লাভ করে আধ্যাত্মিক জগতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেনি। আমি এ রকম সত্তর জনকে দেখেছি, যারা জনাব গাউছুল আযমের প্রদত্ত খেরকা সকাল-সন্ধ্যা বহন করতেন। আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে এ খেদমতের কারণে আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর বরকতময় হাত ওনাদের মাথার উপর রাখার কারণেও ওনাদের উচ্চ মর্যাদা লাভের সহায়ক হয়েছিল। আমিতো প্রতি দিন এ বরকত বৃদ্ধি পেতে দেখছি। আমিতো এ মর্যাদা আপনার আব্বাজানের চেহারা মুবারক দেখে লাভ করি।

শায়খ আলী হায়তী বর্ণনা করেন- হযরত গাউছুল আযমের মুরিদের মত অন্য কারো মুরিদ এত সুভাগ্যবান নয়। তিনি আরও বলেন- শায়খ আবু সাঈদ কারলুবীকে একদিন আমি বলতে শুনেছি যে গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনহু) দরবারে খোদাওয়ান্দি থেকে ততক্ষন ফিরতেন না, যতক্ষন আল্লাহ তাআলা থেকে ওনার মুরিদানের নাজাতের প্রতিশ্রুতি আদায় না করতেন। তিনি আরও বলেন- শায়খ বকা বিন বতু বর্ণনা করেন- আমি গাউছে পাকের গোলামদেরকে উচ্চ মার্যাদায় দেখেছি।

হযরত শায়খ আদী বিন মুসাফির প্রায় সময় বলতেন- গাউছে পাকের বর্তমানে কেউ আমার কাছে খেরকায়ে খেলাফত কামনা করলে আমি ওকে বলতাম- মহা সমুদ্র ছেড়ে কিছক নগন্য খাল থেকে পানি নিতে চেষ্টা করছ।

ইরাকের একদল মাশায়েখ বর্ণনা করেন- আমরা বাগদাদে শায়খ আবু মুহাম্মদ ওয়ায়েজ বিন ইদ্রিস ইয়াকুবীর মজলিসে বসা ছিলাম। সেই মজলিসে শায়খ সালেহ বিন আবু হাফস ওমর বরিদা (রহমতুল্লাহ আলাইহে)ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন- হে শায়খ আলী! রাতের সেই স্বপ্নটি বর্ণনা কর। তিনি বললেন- আমি স্বপ্ন দেখলাম, কিয়ামত শুরু হয়েছে। আল্লাহর সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ উম্মতদেরকে নিয়ে কেয়ামতের মাঠে হাজির হয়েছেন। অতঃপর সরকারে দুআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মতকে সাথে নিয়ে তশরীফ আনলেন। তাঁর উম্মতের মাশায়াখে কেরাম মুরিদানসহ একের পর এক সমুদ্রের ঢেউ এর মত আসতে লাগলেন। মাঝখানে এমন এক শায়খকে দেখা গেল, যার আশে পাশে ছিল লাখ লাখ মুরিদান। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কোন্ বুজুর্গ? আমাকে বলা হলো- এ হলেন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাদি আল্লাহু আনহু)। হযযত শায়খ প্রায় সময় বলতেন-

لِيْ مِنْ كُلِّ طَوِيْلَةٍ فَحْلٌ لَا يُقَادِمُ

وَلِيْ فِيْ كُلِّ اَرْضٍ خَيْلٌ لَايُسَابِقُ

وَلِىْ فِىْ كُلِّ جَيْشٍ سُلْطَانٌ لَايُخَالِقُ

وَلِىْ فِىْ كُلِّ مُنْصَبٍ خَلِيْفَةٌ لَايُعْزَلُ

অর্থাৎ প্রতিটি আনাচে কানাচে আমার এমন বাহিনী আছে, যার মুকাবেলা করা কঠিন। পৃথিবীর সব জায়গায় আমার বাহিনী আছে যাকে কেউ পরাস্থ করতে পারে না। আমার প্রত্যেক বাহিনীর এক জন প্রধান আছে, যার বিরোধীতা করা অসম্ভব। প্রত্যেক বিভাগে আমার প্রতিনিধি রয়েছে, যাকে কেউ বরখাস্ত করতে পারে না।

বাতির আলো ও এর রহস্য

গাউছে পাকের সাহেবজাদা শায়খ আবদুল জাব্বার বর্ণনা করেন– আমার আম্মাজান যখন অন্ধকারে যাতায়ত করতেন, তখন ওনার সামনে একটি চেরাগ প্রজ্জলিত হতো। তিনি সেই চেরাগের আলোতে কাজ সারতেন। এক রাতে আমার আব্বাজন সেই চেরাগের দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে দেখলেন। এতে সেই চেরাগ নিভে গেল। তিনি আমার আম্মাজানকে বললেন– যে চেরাগ তোমাকে আলোদান করছিল সেটা শয়তানের আলো। তাই আমি সেটাকে তাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তোমার জন্য আল্লাহর নূরের ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার সাথে যার সামান্যতমও সম্পর্ক রয়েছে, আমি ওর জন্য এ রকমই করি। যে আমার সাথে সম্পর্ক রাখে, ওর প্রতি আমার অনুগ্রহ বিরাজিত।

শায়খ আবদুল জব্বার বলেন– আমার আম্মাজান যখন ঘরের অভ্যন্তরে আসতেন, তখন তিনি ঘরের কোনায় নূর চমাকাতে দেখতেন। এ নূর চাঁদের আলোর মত দেখাতো। তিনি আরও বলেন, বাগদাদ থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো– 'আমার আব্বা মারা গেছে এবং আমি তাকে স্বপ্ন দেখলাম যে সে আজাব ভোগ করতেছে'। আমি ওকে বললাম, তুমি এখনই গাউছে পাকের খেদমতে হাজির হও এবং ওনার দ্বারা দুআ করাও। যখন লোকটি গাউছে পাকের কাছে গেল তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলো– তোমার আব্বা কি জীবিত থাকাকালীন কোন সময় আমার মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যাতায়ত করেছে? সে বললো– হ্যাঁ, করেছে। এ উত্তর শুনার পর গাউছে পাক নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পর দিন সেই ব্যক্তি পুনরায় এসে বললো, বিগত রাত আমার আব্বাকে আমি আবার স্বপ্নে দেখেছি। তাকে বড় উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তাঁর গায়ের উপর একটি সবুজ চাদর দেখলাম এবং সে বলছিল– আল্লাহ তাআলা আমাকে সমস্ত আজাব থেকে নাজাত দিয়েছেন। এ সব অনুগ্রহ গাউছে পাকের দয়ায় হয়েছে। হে বৎস! সেই মহান ব্যক্তির গোলামী করাকে সৌভাগ্য মনে কর। অন্য আর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে– এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে গাউছে পাকের সামনে আলোচনা করা হলো, যার কবর থেকে এক প্রকার শব্দ শুনা যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– সে কি জিন্দেগীতে আমার খেরকা (জামা) পরিধান করেছিল? লোকেরা বললো– আমাদের জানা নেই। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন– সে কি কোন সময় আমার পিছনে নামায পড়েছিল? লোকেরা

বললো– সেতো এ ব্যাপারে উদাসীন ছিল। তিনি এ উত্তর শুনে মাথা নিচু করলেন। কিছুক্ষন পর মাথা উঠায়ে বললেন– ফিরিশতাগণ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সে জিন্দেগীতে একবার আমাকে দেখেছে এবং মনে মনে আমার প্রতি ভাল ধারনা পোষন করতো। এ জন্য আল্লাহ তাআলা ওর প্রতি রহম করেছেন। পরবর্তীতে লোকেরা ওর কবর থেকে আর কোন শব্দ শুনেনি।

হযরত গাউছে পাক বলেন– হোসাইন হাল্লাজের পদস্খলন হয়েছিল। সে যুগে ওর সহায়তা করার মত কোন কামিল ব্যক্তি ছিল না। আমি যদি সে যুগে হতাম, নিশ্চয়ই ওর সাহায্য করতাম। আমার মুরিদদের কারো পদস্খলন হলে আমি কিয়ামত পর্যন্ত ওর সাহায্যকারী ও আশ্রয় দাতা হবো।

মুশকিল আসান ও হাজত পূরনের জন্য নফল নামায

হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন– যখন আল্লাহর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা কর, তখন আমার মধ্যস্থতায় তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি মসীবত ও বিপদের সময় আমাকে আহবান করে, ওর মসীবত ও বিপদ খুব সহসা দূরীভূত করা হয়। যে ব্যক্তি আমাকে ওসীলা করে প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা আমার ওসীলায় ওর মুশকিল আসান করে দেন। যে ব্যক্তি নিম্নবর্নিত নিয়মে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে, ওর হাজত পূর্ণ হবে।

নিয়ম : প্রতি রাকাতে সূরা এখলাস এগার বার পড়বে। এর পর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবে। অতঃপর এগার কদম বাগদাদ শরীফের দিকে এগিয়ে গিয়ে আমার নাম ধরে ডাক দিবে এবং স্বীয় হাজতের কথা বলবে। আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে তিনি প্রার্থনাকারীর হাজত পূর্ণ করবেন।

বেসাল মুবারকের বর্ণনা

গাউছে পাকের ওফাতের বর্ণনাটা 'কিতাবুল মাজালিস' থেকে উদ্বৃত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নের রেওয়ায়েতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গাউছে পাকের সাহেবজাদা হযরত শায়খ আবদুল ওহাব গাউছে পাকের মৃত্যুসায়াহে অসীয়ত করার জন্য প্রার্থনা করলে, তিনি বলেন– বেটা! তোমাদের জন্য তকওয়া খুবই প্রয়োজন। খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় কর না। কারো কাছে নিজের হাজত পেশ কর না। কারো কাছ থেকে কোন কিছু আশা করিও না। সব সময় স্বীয় হাজত আল্লাহর কাছে কামনা কর। অন্য কারো প্রতি ভরসা করনা। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্ত্বা নির্ভর যোগ্য নয়– 'তৌহিদ, তৌহিদ, তৌহিদ। এটার উপর সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে।

মৃত্যু শয্যায় তিনি আরও বলেন- যখন মনকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কর, তখন অন্য কারো থেকে কিছু কামনা কর না। এটাই আমার কথার সারমর্ম। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বললেন- আমার চকির কাছ থেকে সরে দাঁড়াও। যদিও আমি বাহ্যিক ভাবে তোমাদের সাথে কথা বলছি কিন্তু বাতেনীভাবে অন্যদের সাথে আছি। আমার এবং তোমাদের মধ্যে অনেক দূরত্ব রয়েছে। আমার ও সৃষ্টজীবের মধ্যে দূরত্ব এত অধিক যেমন আসমান-জমীনের দূরত্ব।

আমাকে অন্যদের সাথে তুলনা কর না বা অন্যদেরকে আমার সাথে তুলনা কর না। তোমরা ছাড়াও এ সময় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমার কাছে আসতেছেন। তোমরা ওনাদের জন্য জায়গা খোলামেলা করে দাও এবং ওনাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখ। ওনারা আল্লাহর রহমত বহনকারী। ওনাদের জন্য জায়গা খালি করে দাও।

তাঁর সন্তানদের মধ্যে একজন বলেছেন- মৃত্যু সায়াহ্নে তাঁর জবান থেকে প্রায় সময় বের হচ্ছিল- 'ওয়ালাইকুমুস সালাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে ক্ষমা করুন এবং আমার ও আপনার তওবা কবুল করুন। মৃত্যুর ফিরিশতার ব্যাপাকে আমার কোন ভয় নেই। মৃত্যুর ফিরিশতাতো ওকেই তালাশ করে, যে মৃত্যুরে ভয় করে। হে মৃত্যুর ফিরিশতা, ওকে তালাশ করে নিয়ে এস, যাকে আমার জান কবজের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। এ কথা গুলো বলার পর তিনি জোরে আল্লাহ আকবর বললেন এবং মলকুল মওতের কাছে প্রাণ সোপর্দ করে দিলেন।

ইন্তেকালের একটু আগে তাঁর এক সন্তান তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন- কেউ যেন আমার অবস্থা জানতে না চায় এবং এটাও যেন জিজ্ঞেস না করে যে আল্লাহ তাআলা আমার সাথে কেমন আচরণ করছেন।

তাঁর সাহেবজাদা আবদুর রাজ্জাক (রহমতুল্লাহ আলাইহে) বলেন- মৃত্যু সায়াহ্নে তিনি কয়েকবার হাত বাড়ায়ে বললেন- ওয়ালাইকুমুস সালাম, তওবা কর ও ওদের কাতারে গিয়ে শামিল হয়ে যাও। আমি তোমাদের দিকে আসতেছি। পুনরায় বললেন- একটু নমনীয় আচরন কর। আমি নিজেই আসতেছি। এ কথাগুলো বলার পর পরই তাঁর সকরাত শুরু হয়ে গেল। তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ বলে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

তাঁর অন্য এক সাহেবজাদা হযরত মূসা বলেন- তিনি একান্ত স্বস্থির সাথে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ তিন বার বললেন। এরপর চির দিনের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

গাউছে পাকের প্রবর্তিত সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া মুসলিম জগতে খুবই প্রসার লাভ করেছে। এ সিলসিলার মূল মন্ত্র হলো- যাহেরী শরীয়তকে অগ্রাধিকার দাও এবং কুরআন-সুন্নাহের উপর আমল কর।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১।	জা'আল হক (১)	মুফ্‌তি আহমদ ইয়ার খান
২।	জা'আল হক (২)	"
৩।	সালতানতে মুস্তাফা	"
৪।	আউলীয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৫।	দরসুল কুরআন	"
৬।	ইলমুল কুরআন	"
৭।	অপব্যাখ্যার জবাব	"
৮।	হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ)	"
৯।	ইসলামী জিন্দেগী	"
১০।	ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	আলা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১১।	মাতা-পিতার হক	"
১২।	তাজিমী সিজদা	"
১৩।	পীর মুরীদ ও বায়আত	"
১৪।	বাহারে শরীয়ত	মুফ্‌তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী
১৫।	কানুনে শরীয়ত	মুফ্‌তি শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৬।	কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৭।	যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
১৮।	আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
১৯।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (১)	আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর
২০।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২)	"
২১।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৩)	"
২২।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৪)	"
২৩।	গ্রন্থ পরিচিতি	মুফ্‌তি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
২৪।	সাত মাসায়েলের সমাধান	হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী
২৫।	হামদে খোদা ও নাতে রসূল	মাওলানা মোহাম্মদ আলী
২৬।	খাজা গরীবে নেওয়াজ	মাওলানা আবদুর রশীদ
২৭।	মুমিন কে?	আল্লামা তাহেরুল কাদেরী
২৮।	গাউছুল আযম	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪, মোবাইল ঃ ০১১২১৭১৮৭